লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ২৩তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ আষাঢ়, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ২৮ শাবান, ১৪৩৬ হিজরি | ১৫ ইহসান, ১৩৯৪ হি. শা. | ১৫ জুন, ২০১৫ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

মহানবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও আন্তরিকতা এবং উত্তম ফল লাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হয়" (সহীহ্ বুখারী)।

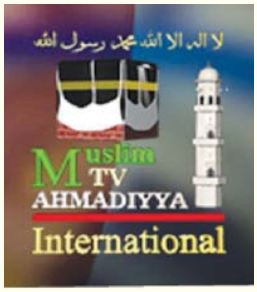

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

১। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

২। শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

৩। রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

৩। বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

এছাড়া বাংলাদেশের অনুষ্ঠান দেখুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন রাত ৮.০০-৯.০০ পর্যন্ত।

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989

E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

মাহে রমযান
রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত লাভের মাস

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমতে আরেকটি রমযান মাসে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ! মাহে রমযান পবিত্র সিয়াম সাধনার মাস। পবিত্র এ মাসকে তিন দশকে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম দশক রহমতের, দ্বিতীয় দশক-মাগফিরাতের আর তৃতীয় দশক হলো নাজাতের। রমযানের প্রাক্কালে আমাদের সবার কামনা হওয়া উচিত- আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে বেশি বেশি রহমত লাভ করা। পবিত্র এই মাসে মু'মিন-মুত্তাকীদের আধ্যাত্মিক-বাগানে ঘটবে নব-বসন্তের সমারোহ। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের একেকটি দুয়ার পেরিয়ে আনন্দে উদ্বেল হবে মু'মিন মুত্তাকীদের হৃদয়, আলোকিত হয়ে উঠবে তাদের আধ্যাত্মিক ভূবন।

> হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে পবিত্র এই রমযানে সুস্থ্যতার সাথে প্রবেশ করার তৌফিক দান কর এবং রহমতের দশকে আমাদেরকে তোমার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান কর।

পবিত্র এ মাস আসে আমাদের জন্য অবারিত ইবাদত বন্দেগীর বাড়তি সুযোগ নিয়ে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মু'মিন মুত্তাকী বান্দারা অন্বেষণ করে খোদা তাআলার প্রেম-বন্ধন। রোযার মাহাত্ম্য ব্যাপক, দিগন্ত-বিস্তৃত এই মাহাত্ম্য ও মর্যাদাকে বুঝাতে গিয়ে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক জিনিসের জন্য নির্দিষ্ট দরজা থাকে আর ইবাদতের দরজা হচ্ছে রোযা' (জামেউস সগীর)। তিনি (সা.) আরো বলেছেন, 'রোযা ঢাল স্বরূপ এবং আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি নিরাপদ দূর্গ' (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)। খোদা তাআলার অশেষ রহমতে আমরা রমযান মাসে প্রবেশ করছি। আমাদের প্রত্যেকের উচিত পবিত্র রমযানের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বুঝে এ থেকে উপকৃত হওয়া। আমরা হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনে রমযানের দিনগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো, তিনি (সা.) রমযানে কত না নফল ইবাদত করতেন। অন্য সময়ের তুলনায় রমযানে তাঁর ইবাদতে গতিময়তা অত্যন্ত বেড়ে যেতো। এ মাসে তিনি কুরআন শিক্ষা, শিখানো ও শোনার প্রতি অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন।

এ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) রোযা সম্পর্কে বলেছেন, 'রমযান বড়ই কল্যাণমন্ডিত মাস, দোয়ার মাস'। তাই আমাদের সবার উচিত, রহমতের দশক থেকে নাজাতের দশক পর্য্যন্ত পুরোপুরি ফায়দা হাসিল করা আর এর অতুলনীয় কল্যাণরাজী দ্বারা নিজেদের সুশোভিত করার সৌভাগ্য লাভ করা। রমযানে কুরআন তেলাওয়াত আর দরসের গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠুক আমাদের চার পাশ। এছাড়া তারাবি, তাহাজ্জুদ প্রভৃতি নফল নামায আর দোয়ার আহাজারিতে যেন জেগে থাকে আমাদের নিঝুম রাতগুলো।

খোদা তাআলার দরবারে আমাদের এই মিনতি, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে পবিত্র এই রমযানে সুস্থ্যতার সাথে প্রবেশ করার তৌফিক দান কর এবং রহমতের দশকে আমাদেরকে তোমার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান কর। আর সেই সাথে পুরো রমযান যেন সুস্থতার সাথে ইবাদত বন্দেগী করে তোমার নৈকট্যের কৃপা লাভ করতে পারি, সেই করুণা তুমি আমাদের করো, আমীন।

সূচিপত্র

১৫ জুন, ২০১৫

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ৬ মার্চ, ২০১৫-এর **জুমুআর খুতবা**। ৬

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ১২
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

কলমের জিহাদ ১৫
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

"বিভিন্ন ধর্মের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ও তাঁর সত্যতা" ১৮
মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন

রোযা দৈহিক ও আধ্যাত্মিক রোগমুক্তির কারণ ২২
মাহমুদ আহমদ সুমন

শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস
সালানা জলসার ইতিবৃত্ত ২৪
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

গিবত একটি জঘন্য পাপ ২৮
মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন

প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঐশী আযাব? ৩০
আলামিন আহমদ

নামাযই প্রকৃত ইবাদত ৩২
আবু সালেহ্ আহমদ

পাঠক কলাম– ৩৪
"পবিত্র রমযানে আমাদের করণীয়"
মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, আনোয়ারা বেগম, ফারহানা মাহমুদ তন্বী

সংবাদ ৩৭

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪১

ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বিশেষ উপদেশ ৪৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ ৪৭

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:
www.youtub.com/shottershondhane
Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আল বাকারা-২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۴﴾

১৮৪। হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের জন্য সেভাবে রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের[২০৬] জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ
اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ
خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

১৮৫। (তোমরা রোযা রাখবে) নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র। তবে তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ অথবা সফরে আছে, তার ক্ষেত্রে অন্যান্য দিনে (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করা বিধেয়। আর যারা এর (অর্থাৎ রোযা রাখার) সামর্থ্য রাখে না,[২০৭] তাদের জন্য 'ফিদিয়া' (রূপে) একজন দরিদ্রকে খাওয়ানো (বাধ্যতামূলক করা) হলো। অতএব, যে স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করে, তা অবশ্যই তার জন্য উত্তম। আর তোমরা যদি জানতে (তাহলে বুঝতে পারতে) রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম।

২০৬। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে রোযা (উপবাস-ব্রত) পালন করা কোন না কোন আকারে সকল ধর্মেই দেখতে পাওয়া যায়। "অধিকাংশ ধর্মগুলোতে এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর কৃষ্টির মধ্যে, উপবাস-ব্রত একটি সাধারণ ভাবে নির্দেশিত ব্যাপার। আর যেখানে এই ধরণের নির্দেশ নেই, সেখানেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাগিদে অনেকেই উপবাস করে থাকেন" (এনসাই-বৃট,)। সাধুপুরুষ ও দিব্যজ্ঞানীগণের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য শারীরিক সম্পর্ক সমূহ কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন থেকে কিছুটা মুক্তিলাভ করা একান্তই প্রয়োজন। তবে ইসলাম এই উপবাস-ব্রতের মধ্যে নবরূপ, নব অর্থ ও নবতম আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করেছে। রোযাকে (উপবাস পালন) ইসলাম পূর্ণমাত্রার আত্মোৎসর্গ মনে করে থাকে। যিনি রোযা পালন করেন, তিনি যে কেবল দেহ রক্ষাকারী খাদ্য-পানীয় হতেই বিরত থাকেন তা নয়, বরং সন্তানাদি জন্মদান তথা বংশবৃদ্ধির ক্রিয়াকলাপ থেকেও দূরে থাকেন। অতএব, যিনি রোযা রাখেন, তিনি আত্মত্যাগে তার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেন। প্রয়োজন বোধে তার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার খাতিরে তিনি তাঁর সবকিছু, এমনকি তার জীবন পর্যন্ত কুরবানী করে দিতে দ্বিধাগ্রস্ত নন।

২০৭। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ করা হয়েছে, যাদের পক্ষে বা যারা অতি কষ্টে এটা (রোযা) করতে পারে। অন্য পাঠ 'ইয়ুতাঈকুনাহু' এই অর্থকে সমর্থন করে (জরীর)। এ আয়াতে তিন শ্রেণীর বিশ্বাসীকে রোযার ব্যাপারে কিছুটা রেহাই বা সুবিধা দেয়া হয়েছে–অসুস্থ, ভ্রমণরত এবং অতি দূর্বলদেরকে। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ এখানে "যারা রোযা রাখতে অসমর্থ" হতে পারে (লিসান ও মুফরাদাত)। সমস্ত বাক্যটির অর্থ এরূপও করা হয়েছে, "রোযা রাখা ছাড়াও, অতিরিক্ত পুণ্য অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ" গরীবদেরকে খাওয়াতে পারেন। সেক্ষেত্রে 'ইয়ুতিকুনাহু'র 'হু' সর্বনামটি একজন গরীবকে "খাওয়ানোর" পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে।

হাদীস শরীফ

রমযানের রোযা পাপ ক্ষমার মাধ্যম

কুরআন ঃ

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে পার (সূরা বাকারা ১৮৪)।

যদি কেউ রোযা পালনের মাধ্যমে নিজের মাঝে তাক্‌ওয়া সৃষ্টি করে নেয় এবং নিজের সংশোধন করে নেয়, আর কখনও পাপের দিকে ফিরে না তাকায় তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি খোদা দয়া পরবশ হয়ে তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসুল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও উত্তম ফল লাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ

রমযান একটি পবিত্র মাস। এ মাসের ইবাদত খোদার নিকট সবচে' প্রিয়। কারণ, নামায ও রোযার সমন্বয় মানুষের মধ্যে খোদার নৈকট্য লাভের এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। তা এভাবে যে, নামায আত্মাকে পবিত্র করে এবং রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। ফলশ্রুতিতে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি রোযা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার এক নতুন রাস্তায় পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টির ছায়াতলে চলে আসে। কুরআন বলে যে, রোযা তোমাদের মাঝে তাক্‌ওয়া অর্থাৎ খোদা-ভীতি সৃষ্টি করবে। এ তাক্‌ওয়া কিভাবে সৃষ্টি হবে? বস্তুত রোযা এমন ইবাদত, যা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিয়ন্ত্রণ করে। যদি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ না রেখে কেউ রোযা রাখে, তবে এটা রোযা নয় বরং অন্য কিছু। খোদা-ভীতির সৃষ্টি এভাবেই হয় যে, মানুষ খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের মন-মেজাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খোদার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে সে তার অবাধ্য-আত্মার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। তখন ঐ সকল কর্ম হতে সে দূরে সরে পড়ে, যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ পূর্ণ শর্তাবলীর সাথে রোযা পালন করে, তবে তার পূর্বেকার সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এর অর্থ হলো, রমযান তাক্‌ওয়ার সৃষ্টি করে থাকে। যদি কেউ রোযা পালনের মাধ্যমে নিজের মাঝে তাক্‌ওয়া সৃষ্টি করে নেয় ও ***তওবাতুন নসূহ্*** (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গীন তওবা দ্বারা নিজের সংশোধন করে নেয়, আর কখনও পাপের দিকে ফিরে না তাকায়) করে, তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি খোদা দয়া পরবশ হয়ে তার গুনাহ্ মাফ করে দেন।

রোযার মাস সংযমের মাস, সাধনার মাস। আসুন! এ রমযানে আমরা চেষ্টা করি, সাধনা করি, যেন আমাদের অবাধ্য আত্মা অর্থাৎ ***'নফসে আম্মারা'*** প্রশান্তি-প্রাপ্ত আত্মাতে অর্থাৎ ***'নফসে মুতমাইন্না'***তে পরিণত হয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে পবিত্র রমযান মাসে এ সাধনা করার তৌফীক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

রোযার মাহাত্ম সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, "অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্ম-শুদ্ধির জন্য আবশ্যক। এতে দিব্য-দর্শন শক্তি (*কাশ্‌ফী তাক্‌ত*) বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না। যে ব্যক্তি অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ্য করা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর "ঐশী ক্রোধ" (*কহরে ইলাহী*) আনয়ন করে। কিন্তু রোযাদারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, রোযার অর্থ শুধু এটাই নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকবে; বরং খোদার যিক্‌র অর্থাৎ তাঁর স্মরণে মশগুল থাকা উচিত। রমযান শরীফে মহানবী (সা.) অনেক বেশী ইবাদত করতেন। এই দিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করা চাই। দুর্ভাগ্য ঐ ব্যক্তির, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে, কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্য পরওয়া করে না। বাহ্যিক খাদ্য দ্বারা দৈহিক শক্তি লাভ হয়, একই ভাবে আধ্যাত্মিক-খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং তদ্বারা আত্মার শক্তিগুলো সতেজ হয়। খোদার কাছে সাফল্য চাও। কারণ, তিনি সামর্থ্য দিলেই সকল দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।"

রোযাদারের সর্বদা এ কথা দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, ক্ষুধার্ত থাকাই তার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উচিত, সে খোদা তা'লার যিক্‌র-এ রত থাকবে, যাতে দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্-মুখী হওয়া যায়।

"কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয়, বরং এর একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায়, ততই তার আত্মশুদ্ধি এবং দিব্য-দর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় এটাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে, অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। সর্বদাই এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া রোযাদারের কর্তব্য।

খোদা তা'লার যিক্‌র বা স্মরণের মধ্যেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব, রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে, যা আত্মার প্রশান্তি এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক আচার-অনুষ্ঠানের রোযা রাখে না, শুধু খোদার জন্যই রোযা রাখে তার উচিত, সে যেন সর্বদা ***হাম্‌দ*** (প্রশংসা কীর্তন), ***তাসবীহ্*** (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা মাহাত্ম্য ঘোষণা) এবং ***তাহলীলের*** (আল্লাহ্‌র তৌহীদ ঘোষণা) মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয়-খাদ্যের (আধ্যাত্মিক খাদ্যের) সৌভাগ্য লাভ হয়" (আল হাকাম, ১৭-১-১৯০৭)।

"রোযাদারের সর্বদা এ কথা দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, ক্ষুধার্ত থাকাই তার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উচিত, সে খোদা তা'লার যিক্‌র-এ রত থাকবে, যাতে দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্-মুখী হওয়া যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য এটাই যে, মানুষ একটি রুটি ছেড়ে দিয়ে, যা কেবল দেহ প্রতিপালন করে, দ্বিতীয় রুটি লাভ করে, যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ। যারা কেবল খোদার জন্য রোযা রাখে, তাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার ***'হাম্‌দ'*** (প্রশংসা), ***'তস্‌বীহ্'*** (গুণকীর্তন করা) ও ***'তাহলীল'*** (***লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্***) পাঠে রত থাকা, যদ্দরুন অন্য খাদ্যও তারা পেয়ে যায়" (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১২৩)।

জুমুআর খুতবা

তাকওয়া বা খোদাভীরুতার প্রকৃত তাৎপর্য

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৬ মার্চ, ২০১৫-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۞

এই আয়াত দু'টো সূরা হাশর থেকে নেয়া হয়েছে। এর অনুবাদ হলো, হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তির এ কথার ওপর দৃষ্টি রাখা উচিত যে, সে আগামী দিনের জন্য কী অগ্রে প্রেরণ করছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা-ই কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, ফলে তিনিও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই দুষ্কৃতকারী। (সূরা হাশর : ১৯-২০)

সচরাচর যা দেখা যায় তাহলো, সকল পাপ এবং গুনাহ্‌র মূল কারণ হচ্ছে, সেসব পাপ এবং গুনাহ্‌কে তুচ্ছ মনে করে সেগুলো

এড়িয়ে চলার চেষ্টা না করা বা সেদিকে মনোযোগ না দেয়া। কিন্তু এই অসাবধানতাই পরবর্তীতে মানুষকে বড় পাপে লিপ্ত করে কেননা, এরফলে মানুষ ধীরে ধীরে নেকি এবং পুণ্যকে ভুলে যায় এবং পুণ্যের সেই মানকে ভুলে বসে যাতে এক মু'মিনের উপনীত হওয়া উচিত, খোদার ভয় কমে যায়, তাক্বওয়ার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, মৃত্যুত্তর জীবনে পূর্ণ বিশ্বাস থাকে না। এক কথায় ঈমানের দাবীদার এক ব্যক্তি কার্যতঃ ঈমানের আবশ্যকীয় শর্তাবলী মেনে চলা ছেড়ে দেয় আর এরফলে খোদার পবিত্র দৃষ্টিতে সে আর মু'মিন হিসেবে গণ্য হয় না। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের দৃষ্টি এদিকেই আকর্ষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত জোরালভাবে বা তাকিদপূর্ণভাবে বলেন, কেবল ইহকালের বা এই পৃথিবীর ক্রীড়া-কৌতুক, পার্থিব আকর্ষণ, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব নিয়েই মত্ত থাকবে না বা উদ্বিগ্ন থাকবে না বরং তোমাদের মূল চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত ভবিষ্যৎ বা আগামী দিন। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তায় তোমাদের ঈমানের মান এবং আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন করা তোমাদের জীবনের মূল অগ্রগণ্য বিষয় বা মূল চিন্তার কারণ হওয়া উচিত। তোমাদের মৃত্যুত্তর জীবন এবং পারলৌকিক জীবনে হিসেব-নিকেশের ওপর ঈমান তোমাদের চিন্তা-ধারা বা চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত। যদি এমনটি হয় কেবল তবেই তোমাদের সত্যিকার চারিত্রিক উন্নতি হবে এবং তা কেবল ভাসাভাসা বা বাহ্যিক চারিত্রিক গুণ হবে না বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য-সম্বলিত হবে। তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং মু'মিন হওয়ার দাবী তখনই প্রকৃত বলে গণ্য হবে যখন আগামী দিন বা পরকালের ওপর তোমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে। খোদার সত্তায় তোমাদের ঈমান, নিশ্চিত, নিঃস্বার্থ এবং সত্যভিত্তিক তখনই তাঁর দৃষ্টিতে বস্তুনিষ্ঠ গণ্য হবে যখন আগামী দিন বা পরকালকে সামনে রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে এবং তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার বিষয়ে সচেষ্ট থাকবে। প্রথম যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! খোদা ভীতির মাঝে জীবন অতিবাহিত কর আর তোমাদের প্রত্যেকের এ কথার ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা চাই যে, আমি পরকালের জন্য কী অগ্রে প্রেরণ করেছি এবং সেই খোদাকে ভয় কর যিনি সর্বজ্ঞানী। তোমাদের প্রতিটি কর্মের প্রতি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে অর্থাৎ, তিনি সবিশেষ অবহিত এবং বিচার-বিশ্লেষণকারী। তাই তিনি কোনভাবেই তোমাদের ত্রুটিপূর্ণ আমল বা কর্ম গ্রহণ করবেন না।" (সত বচন,রূহানী খাযায়েন দশম খণ্ড; পৃ:২২৫-২২৬)

অতএব আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশটি আমাদের প্রত্যেককে গভীর প্রণিধান ও চেষ্টা করে বুঝতে হবে অর্থাৎ, খোদাভীতির আলোকে আমাদের নিজেদের কর্মের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। সে সকল কথার ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখা যা আমাদের পরকালকে সুনিশ্চিত করবে। আল্লাহ্ তা'লা যিনি আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ সম্পর্কেও অবহিত এবং আমাদের সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে, তাঁকে শুধু বাহ্যিক কথা-বার্তায় ভোলানো বা প্রতারিত করা সম্ভব নয়। বরং যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা মেকী ও খাঁটির মাঝে পার্থক্য করে থাকেন। ভেজাল বা ত্রুটিপূর্ণ কর্ম বা আমল তিনি গ্রহণ করবেন না। তাই একজন মু'মিনের জন্য এটি অনেক বড় চিন্তার বিষয় অর্থাৎ, তার পরকাল সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত যেখানে মানুষের কর্মের হিসাব হবে। যারা মু'মিন নয়, তাদের মত আমরা যেন এই ইহজগতকেই সবকিছু মনে না করি বরং সত্যিকার সফলতা লাভের জন্য আমাদের উচিত তাক্বওয়া অবলম্বন করা। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন,

'ইহকালে ও পরকালে সাফল্য লাভের একটি রহস্য আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে উন্মোচন করেছেন আর তাহলো, মানুষের আজই আগামীকালের জন্য চিন্তা করা। এরফলে ইহজীবনও সুন্দর ও সুসজ্জিত হবে আর পরকালও সুন্দর এবং সুনিশ্চিত হবে।' তিনি (রা.) আরো বলেন, 'পবিত্র কুরআনের শিক্ষা 'ওয়াল তানযুর নাফসুম্মা কাদ্দামাত লি গাদ' মেনে চললে মানুষ কেবল ইহজীবনেই সফলকাম হয় না বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পরকালেও সাফল্য লাভ করে। আমরা কখনও পারলৌকিক জীবনের জন্য পাথেয় বা পূঁজী সংগ্রহ করতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আজ থেকেই সেই স্থায়ী নিবাসের জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করব।' (হাকায়েকুল ফুরকান চতুর্থ খণ্ড,পৃ:৬৬-৬৭)

এ দৃষ্টিকোন থেকে আমি একথাও বলতে চাই, এই আয়াতটি আমরা বিয়ের খুতবাতেও পাঠ করে থাকি। বিয়ের খুতবায় যেসব আয়াত পাঠ করা হয় এটি সেগুলোর শেষ আয়াত। নিকাহ্ বা বিয়ের খুতবায় যে আয়াতগুলো পাঠ করা হয় সেগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, তোমরা তোমাদের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও দায়িত্ববান হবে আর এই সম্পর্কের সুবাদে যে দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পিত হয় তাও পালন কর। সততা অবলম্বন কর কেননা এরফলে সৎকর্মের এবং আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবে। যদি সত্যের

সে সকল পরিবার বা সেসব মানুষ যারা তুচ্ছ কারণে নিজেদের ঘর ধ্বংস করছে, যদি তারা খোদার নির্দেশ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং তার ওপর আমল করা শুরু করে তাহলে তারা শুধু নিজেদের ঘরেরই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করবে না বরং নিজ সন্তানদের সঠিক তরবীয়ত ও সুশিক্ষা এবং তাদের জন্য তাক্বওয়ার পথের দিশারীও হয়ে যাবে।

ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ মেনে চল তাহলে এতে তোমাদের সফলতার নিশ্চয়তা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, যদি পরকালের বিষয়ে সচেতন থাক তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশাবলীর প্রতিও তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের অগণিত নির্দেশাবলী রয়েছে যা পারিবারিক জীবনকে আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মানুষ যদি ভাবে এবং চিন্তা করে তাহলে সে নিজেই এর মাধ্যমে লাভবান হয়, যেমনটি কি-না হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেছেন, তাদের ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই সুন্দর ও নিরাপদ হয়ে যাবে। ইহকালে পারিবারিক জীবন জান্নাতপ্রতীম হয়ে উঠবে এবং খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলার কল্যাণে পারলৌকিক পুরস্কারও লাভ হবে। অধিকন্তু সে কেবল নিজেই উপকৃত হবে না বরং তার সন্তান-সন্ততিও এ কারণে পুণ্যের পথে অগ্রসর হবে। এক কথায় সে শুধু নিজের ভবিষ্যতকেই সুনিশ্চিত করছে না বরং একটি প্রকৃত মু'মিন ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও নিশ্চয়তার বিধান করবে বরং বিধান করে থাকে কেননা, সাধারণত এমন ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও পুণ্যের ওপর বিচরণকারী হয়ে থাকে।

অতএব সে সকল পরিবার বা সেসব মানুষ যারা তুচ্ছ কারণে নিজেদের ঘর ধ্বংস করছে, যদি তারা খোদার নির্দেশ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং তার ওপর আমল করা শুরু করে তাহলে তারা শুধু নিজেদের ঘরেরই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করবে না বরং নিজ সন্তানদের সঠিক তরবীয়ত ও সুশিক্ষা এবং তাদের জন্য তাক্বওয়ার পথের দিশারীও হয়ে যাবে। আর তাদের জীবন সুন্দর ও সুশোভিত করারও কারণ হবে বরং খোদা তা'লার পুরস্কার তারা ইহজীবনেও লাভ করবে আর পরকালেও লাভ করবে। অতএব এমন পরিবারগুলোকে চিন্তা করা উচিত যারা তুচ্ছ কারণে শুধুমাত্র জাগতিক স্বার্থে নিজেদের ঘরগুলোকে ধ্বংস করছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শুধু আপনাদেরই সন্তান নয় বরং তারা জামাত এবং জাতিরও সম্পদ। তাদের সঠিক পথ দেখানো পিতা-মাতার দায়িত্ব আর এটি তখনই সম্ভব যদি পিতা-মাতা নিজেদেরকে খোদা এবং তাঁর রসূলের শিক্ষার অধিনস্ত রাখার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

এ হলো একটি দিক যে বিষয়ে সকল মু'মিনের চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতি আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেন নিজের এবং সন্তান-সন্ততির ইহ এবং পরকাল সুনিশ্চিত করা যায়। আমাদের জীবনে অগণিত এমন মুহূর্ত আসে যখন আমরা তাক্বওয়ার নীতি অনুসরণ করি না, পরকালের প্রতি দৃষ্টি রাখি না, এ পৃথিবীর উপায়-উপকরণকেই সবকিছু মনে করি, অজ্ঞাতে বা অবচেতন মনে জাগতিক অবলম্বনকে আল্লাহ্ তা'লার ওপর প্রাধান্য দেই। এছাড়া নিজের দুর্বলতা, অযোগ্যতা ও আলস্যের কারণে ইহলৌকীক ভবিষ্যতকেও ধ্বংস করি। নিজের ঐহিক আগামীকেও ধ্বংস করি আর পারলৌকিক স্বার্থকেও অবজ্ঞা করি। একবারও ভাবি না, এর ফলাফল কত ভয়াবহ হতে পারে।

একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) খুবই সংক্ষিপ্ত কথার মাধ্যমে এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, মু'মিনের উচিত কর্মের পরিণাম সম্পর্কে প্রথমে চিন্তা করা যে, এর ফলাফল কী দাঁড়াবে। মানুষ রাগের মাথায় হত্যা করতে চায়, গালি দেয়, কিন্তু তার ভাবা উচিত যে, এর পরিণাম কী হবে। এই মূলকথাকে দৃষ্টিপটে রাখলে সে তাক্বওয়ার ওপর পদচারণার তৌফিক পাবে। যদি আমরা দেখি তাহলে স্পষ্ট হবে যে, সকল পাপ এবং গুনাহ্‌র কারণ হলো, মানুষ যখন সেই পাপ করে তখন তার মাথায় এক খান্নাস বিরাজ করে বা এক শয়তান বিরাজ করে। অপরিণামদর্শী হয়ে কাজ হয়ে থাকে। কোন হত্যাকারী বা খুনী বা পাপাচারী স্বেচ্ছায় অপরাধের ফলাফল মাথা পেতে নেবে; এমনটি বিরলই হয়ে থাকে। এমন মানুষ যারা স্বীকার করে বা শাস্তি মাথা পেতে নেয়ার দাবী করে তারা বদ্ধউন্মাদ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষ যখন এই উন্মাদনার অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে তখন সে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে। যারা পেশাদার অপরাধী তাদের কথা ভিন্ন, তারা এর বাইরে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের কথা বলছেন না যারা অপরাধে অভ্যস্ত বা যারা পুরো উন্মাদ বরং যারা ঈমানের দাবী করে তাদের কথা বলছেন, মু'মিনের পরিচয় হলো, আগামী দিনের ওপর বা ভবিষ্যতের ওপর দৃষ্টি রাখা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন থাকা।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ফলাফল বা পরিণতি বা আগামী দিনের ওপর কীভাবে দৃষ্টি রাখতে হয় সে সম্পর্কে বলেন, 'এ কথার ওপর ঈমান থাকা চাই, 'ওয়াল্লাহু খায়রুম বিমা তা'মালুন' অর্থাৎ, তোমরা যে কাজই কর আল্লাহ্ তা'লা সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। মানুষ যদি এই বিশ্বাস রাখে, কোন সবিশেষ অবহিত এবং সর্বজ্ঞানী বাদশাহ্ রয়েছেন যিনি সকল প্রকার পাপাচারিতা, প্রতারণা, ধোঁকা এবং আলস্য ও ঔদাসীন্যকে দেখছেন এবং এর শাস্তি দিবেন তাহলে সে এথেকে রেহাই পেতে পারে বা বাঁচতে পারে। তিনি (রা.) আরো বলেন, এমন ঈমান সৃষ্টি কর। এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের দায়িত্ব, চাকরি, পেশা, কাজকর্ম ইত্যাদিতে আলস্য দেখায়। এমনটি করলে আয় উপার্জন বা রিযিক আর হালাল থাকে না'। (হাকায়েকুল ফুরকান চতুর্থ খণ্ড,পৃ:৬৭-৬৮)

অর্থাৎ, জাগতিক বিষয়েও যারা আলস্য দেখায় এবং নিজ দায়িত্ব পালন করে না তারাও নিজেদের আগামী দিন বা ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে এবং যে রিযিক বা জীবিকা তারা উপার্জন করে তা আর হালাল থাকে না কেননা, এটি প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জিত বা লব্ধ রিযিক।

অতএব এই আয়াত যা আগামী দিনের ওপর বা ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখার বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করছে তা অতি ব্যাপক একটি আয়াত এবং প্রতিটি পদক্ষেপে একজন প্রকৃত মু'মিনকে কোন সামান্য দুর্বলতা বা পাপের দিকেও অগ্রসর হতে বারণ করে বা সেই পথে বাঁধা সৃষ্টি করে।

তাই আমাদের নিজেদের মাঝে এই বিশ্বাস সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ, আমরা যেন এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারি, খোদা তা'লা আমাদের প্রতিটি কাজ-কর্মকে দেখছেন। আর এ কথার ওপরও দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই, তিনি আমাদের সকল প্রকার ধোঁকা ও প্রতারণাও দেখছেন যা তুচ্ছ মনে করে সামান্য লাভের উদ্দেশ্যে আমরা করে থাকি বা কাজে যদি আলস্য দেখাই বা জেনে-শুনে চুক্তি অনুসারে কাজ সমাপ্ত না করি, এভাবে হয়তো কারো ওপর চাপ সৃষ্টি করে সমধিক সার্থসিদ্ধি করা

যাবে। তাহলে স্মরণ রাখবেন, এমন আচরণ খোদার পছন্দ নয়। আর যা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় এর প্রতিদান যেভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-ও বলেছেন, মানুষ অবশ্যই এর পরিণাম দেখবে আর এর পরিণাম বা ফলাফল হয়ে থাকে শাস্তি।

তাই মু'মিনকে আগামী দিনের ওপর বা ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলে তার সামান্য পারিবারিক বিষয়াদি থেকে আরম্ভ করে সামাজিক, বাণিজ্যিক, দেশীয়, আন্তর্জাতিক এক কথায় সকল ক্ষেত্রে তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। আর যে তাক্বওয়ার দাবী অনুসারে জীবন-যাপন করে না তার এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত, এমন মানুষ অবশ্যই আল্লাহ্‌র শাস্তির লক্ষ্যে পরিণত হবে। মানুষের এ কথা মনে করা উচিত নয়, ধর্মের সাথে জাগতিক বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। মু'মিনের জন্য তাক্বওয়ার পথে পদচারণার নির্দেশ রয়েছে। আর তাক্বওয়ার মাঝে সকল জাগতিক এবং ধর্মীয় কার্যাবলিকে আল্লাহ্‌র নির্দেশের অধীনে পালন করা আবশ্যক। অনেক সময় মানুষ জাগতিক ক্ষয়ক্ষতির পরীক্ষা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। সে মনে করে, যেভাবেই হোক না কেন অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে হবে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, এমন কোন রীতি যার অধীনে প্রতারণার মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধি করা হয় তা মানুষকে ধর্ম এবং ঈমান থেকে দূরে ঠেলে দেয়। আর এই বাহ্যিক বা জাগতিক বিষয় ধর্মের ক্ষেত্রে বা ধর্মের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে থাকে আর আমি যেমনটি বলেছি, তা ধীরে ধীরে ধর্ম এবং খোদা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। এ কারণেই একজন মু'মিনের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, ঈমানের পরীক্ষা জাগতিক পরীক্ষার চেয়ে অনেক ভয়াবহ হয়ে থাকে। এর ফলে ইহকাল এবং পরকাল উভয়-ই ধ্বংস হয়ে যায়।

অতএব এই চিন্তা-চেতনার সাথে আমাদের নিজেদের হৃদয়কে বিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত আর এজন্য প্রতিটি কাজের পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত কেননা, আমার প্রতিটি কর্মের ওপর খোদার দৃষ্টি রয়েছে। এই চিন্তা-চেতনা যদি সৃষ্টি হয় তাহলে একজন মু'মিন প্রকৃত অর্থে মু'মিন হয় বা প্রকৃত মু'মিন হওয়ার পথে সে অগ্রসর হয়। এই মান বা মানে উপনীত হওয়ার জন্য কোন জামাতী বা অঙ্গ সংগঠনের রিপোর্ট ফরম দেখা বা এর ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি, সে এই মানে উপনীত কি-না তা সে নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে পারে অর্থাৎ প্রত্যেক কাজের পূর্বে তার মাথায় এই ধারণা জাগ্রত হয় কি-না যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার এই কাজ দেখছেন। যদি আমি পবিত্র মন-মানসিকতা নিয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে থাকি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার বহুগুণ প্রতিদান বা পুরস্কারেরও প্রতিশ্রুতি রয়েছে আর যদি নিয়্যতে দুরভিসন্ধি থাকে তাহলে মানুষের মনে রাখা উচিত, আমি খোদার হাতে ধরাও পড়তে পারি। আমাদের সকলেই যদি এমন চিন্তা-চেতনা নিয়ে নিজেদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে এবং পালনের চেষ্টা করে তাহলে জামাতের সার্বিক তাক্বওয়ার মান উন্নত হবে আর জামাতী পর্যায়েও তাক্বওয়ার এই উন্নত মান সহসাই দৃষ্টিগোচর হবে। তরবীয়ত বিভাগও সমস্যার সম্মুখীন হবে না আর উমুরে আমা এবং বিচার বিভাগের জন্যও আর কোন সমস্যা থাকবে না। অন্যান্য বিভাগকেও তখন আর স্মরণ করাতে হবে না।

তাই নিজেদের হৃদয়কে সবসময়, সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা বিশ্লেষণ করা উচিত আর শয়তানের আক্রমন হতে নিজেদের বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন। যদি কোন সময় এদিকে দৃষ্টি না যায় তাহলে শয়তানের কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। একথা ভুলানোর ক্ষেত্রে শয়তানই ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলানোর ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা শয়তানেরই হয়ে থাকে। আগামী দিনের জন্য যদি চিন্তা না থাকে তাহলে শয়তানই মানুষকে তা ভুলিয়ে থাকে। শয়তানই বলে, একথা ভুলে যাও, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে দেখছেন। যদি আমরা খতিয়ে দেখি তাহলে সুস্পষ্ট হবে, অধিকাংশ মানুষ ভাবেই না বা চিন্তাই করে না, আমার কাজের ওপর খোদা তা'লার দৃষ্টি রয়েছে এবং এর পরিণাম বা পরিণতি কী হতে পারে। এসব কিছুর কারণ হলো, মহানবী (সা.) যেভাবে বলেছেন, শয়তান মানুষের রক্তের সাথে তার দেহে সঞ্চালিত হয়। অনেক রোগ-ব্যাধি মানুষের এ কারণে ক্ষতি করে, কোন কারণে দেহে ইনফেকশন হয় আর রক্তপ্রবাহের সাথে তা শরীরে ঘূর্ণায়মান থাকে। ধীরে ধীরে তা ছড়াতে থাকে এবং এক সময় তা দেহের ওপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করে। প্রথম দিকে মানুষ জানতেই পারে না যে, রোগের আক্রমন হয়েছে বরং কেউ যদি অনেক সাবধানও হয় আর সামান্য আলস্যের পর ডাক্তারের কাছে গেলেও প্রথম দিকে অনেক ডাক্তারও বুঝে না, ভেতরে কোন রোগ আছে যা রক্তের সাথে দেহে সঞ্চালিত হচ্ছে। যেমনটি আমি বলেছি, বায়ুতে বা বায়ুমণ্ডলে অনেক সময় জীবাণু থেকে থাকে, একজনের দেহ থেকে তা অন্যের মাঝে সংক্রামিত হয় আর এভাবে রোগ-ব্যাধি ছড়ায়। আজও অনেক মহামারির প্রকোপ আমাদের চোখে পড়ে। প্রথম দিকে বুঝাই যায় না, ধীরে ধীরে যখন তা ছড়িয়ে পড়ে তখন বুঝা যায়। কিন্তু আজকের যুগের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি হলো, এ যুগের আধ্যাত্মিক ব্যাধি বা আধ্যাত্মিক রোগ।

আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি বর্তমানে অনেক বেশি ছড়িয়ে রয়েছে অথচ মানুষ তা বুঝতেই পারছে না, কখন শয়তান তার রক্তে ঢুকে গেছে আর আধ্যাত্মিক ব্যাধি ছড়াতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু রক্তে শয়তানের আবর্তনের ফলে যেই রোগ দেখা দেয় তা দৈহিক ব্যাধির চেয়ে এই দিক থেকে বেশি ভয়াবহ, দৈহিক ব্যাধির ফলে দেহ প্রভাবিত হওয়া আরম্ভ হয়, দেহে ব্যথা-বেদনা দেখা দেয়, আলস্য দেখা দেয়। সময়ের সাথে সাথে কষ্ট বাড়তে থাকে। মানুষ তখন তা নিজেই অনুভব করে আর ডাক্তারের কাছে যায় এবং বলে, আমি অসুস্থ, আমাকে ঔষধ দাও। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাধি এই অর্থে বেশি ভয়াবহ, খোদা তা'লা থেকে মানুষ যখন দূরে সরে যায় আর শয়তানের আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত হয়, তখনও সে নিজেকে অসুস্থ মনে করে না বরং মনে করে, আমি ভালই আছি। কিন্তু তার বন্ধু-বান্ধব, তার প্রতি সহানুভূতিশীলরা যখন বুঝতে পারে, সে অসুস্থ তখন তারা তাকে বুঝায়। বন্ধুদের মনোযোগ আকর্ষণ করা সত্ত্বেও যারা রোগের চরম সীমায় পৌঁছে যায় তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুদের ভুল বুঝে। তারা মনে করে, আমার বন্ধুরা আমাকে ভুল বলছে এবং নিজেকে সে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করে।

অতএব শয়তানের আক্রমণ বা আধ্যাত্মিক ব্যাধি দৈহিক রোগ-ব্যাধির চেয়ে অনেক

ভয়াবহ হয়ে থাকে কেননা, প্রায়শই মানুষ এর জন্য কোন চিকিৎসা গ্রহণ করা পছন্দ করে না। অন্যরা চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করলেও সে এদিকে দৃষ্টি দেয় না।

অতএব রোগের আক্রমনের পূর্বেই একজন মু'মিনকে নিজের অবস্থা এবং অবস্থান খতিয়ে দেখে সাবধানতামূলক পদক্ষেপ নেয়া উচিত। আর এই সমাজে আমি যেমনটি বলেছি, বায়ুমণ্ডলে স্থায়ীভাবে আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি বিরাজ করছে। তাই আত্মরক্ষার জন্য অব্যাহত আমল বা স্থায়ী চিকিৎসারও প্রয়োজন রয়েছে এবং সাবধানতামূলক ব্যবস্থা নেয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। আর এটিই একজন প্রকৃত মু'মিনের জন্য আবশ্যক এবং তার উচিত এই উদ্দেশ্যে অবিরাম চেষ্টা-সাধনা করা। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, মু'মিন কখনও আল্লাহ্‌র ভয় থেকে মুক্ত থাকে না এবং থাকা উচিতও নয়। মহানবী (সা.) সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, রাতে যখনই তিনি উঠতেন অতি বিনয় এবং নম্রতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করতেন। একবার হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর এই অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন, খোদা তা'লা আপনার সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনার এত দুঃশ্চিন্তার প্রয়োজন কী, এত ভয়-ভীতির সাথে নিজের জন্য কেন দোয়া করছেন? আপনার নিজের জন্য এত ভয়ের কারণ কী? বরং মহানবী (সা.) তো এ কথাও বলেছেন, মানুষের রক্তে শয়তান আবর্তিত হয় বা সঞ্চালিত হয়। তিনি (সা.) বলেছেন, আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে; অর্থাৎ কোন অধ্যাত্মিক ব্যাধির আক্রমন হানার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু তিনি (সা.) বলেছেন , আমার মুক্তিও খোদার কৃপার ওপরেই নির্ভরশীল। আমারও স্থায়ীভাবে তাঁর সামনে বিনত বা সিজদাবনত থাকা প্রয়োজন। এসব কিছু সত্ত্বেও যেখানে মহানবী (সা.) এত বিনয় এবং ভীতি প্রকাশ করে থাকেন সেখানে আর কে আছে যে বলতে পারে, আমার সবসময় এবং সকল কাজের ক্ষেত্রে আগামী দিনের ওপর দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন নেই এবং কাজ করার পর খোদার কৃপার সন্ধানে রত থাকার দরকার নেই।

তাই সবসময় সচেতন এবং সতর্ক থাকা উচিত। তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে সর্বদা নিজেদের কাজ এবং নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। সবসময় খোদার কাছে তাঁর করুণা ভিক্ষা চাইতে থাকা আবশ্যক। সবসময় হৃদয়ে এই চিন্তা-চেতনা বিরাজমান থাকা উচিত, আমি আমার ঈমানকে কীভাবে নিরাপদ রাখতে পারি আর এ দিকেই পরবর্তী আয়াত যা আমি পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অর্থাৎ তাদের মত হয়ে যেও না যারা আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে গেছে। কেননা এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তাদের নিজের সত্তা সম্বন্ধেই উদাসীন করে দিবেন। আমি যেভাবে দৃষ্টান্ত দিয়েছি, আধ্যাত্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদেরকে অসুস্থ মনে করে না বরং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলরা তাদেরকে অসুস্থ মনে করে তাদের চিকিৎসার চেষ্টা করলে তারা উল্টো সহানুভূতিশীলদেরই অসুস্থ এবং উন্মাদ মনে করে। এককথায়, আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিজেদেরকে চেনার বিষয়ে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন করে দেয় আর এর ফলাফল ধ্বংস এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায় না। স্মরণ রাখা উচিত, মানুষ সচরাচর আল্লাহ্ তা'লাকে তিনভাবে ভুলে যায় বা সচরাচর তিন ধরণের মানুষ পৃথিবীতে আমাদের চোখে পড়ে যারা খোদা থেকে দূরে সরে গেছে বা দূরে অবস্থান করে।

প্রধানতঃ এমন মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে আর চরম ধৃষ্টতার সাথে বলে, আল্লাহ্ বলতে কিছু নেই। যেভাবে আজকালকার মানুষের এক বিশাল শ্রেণী এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যারা শিক্ষিত হওয়ার দাবী করে। তারা নিজেদের শিক্ষা নিয়ে বড় গর্ব করে। আর এরা প্রচার মাধ্যম ও ইন্টারনেটে বিভিন্নভাবে যুবকশ্রেণী ও অপরিপক্ক মন-মানসিকতার অধিকারী লোকদের নিজেদের ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে বিষিয়ে তোলে।

দ্বিতীয় শ্রেণী তারা যাদের সর্বশক্তির আধার খোদার ওপর প্রকৃত এবং সত্যিকার ঈমান নেই, যার সামনে একদিন তাদেরকে উপস্থিত হতে হবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য জবাব দিতে হবে। যদিও তারা এই ঈমান বা বিশ্বাস রাখে বা এ কথা স্বীকার করে, একজন খোদা আছেন যিনি এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর অধীনে একটি ব্যবস্থাপনা কাজ করছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কথার ওপর তারা আমল করে না।

আর তৃতীয় শ্রেণী তারা যারা জাগতিক ঝঞ্ঝাটে এতটাই নিমজ্জিত, আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে। কখনো কোন সময় স্মরণ হলে নামাযও পড়বে আর দোয়াও করবে কিন্তু কোন স্থায়ীত্ব বা অবিচলতা নেই। এদিকে মনোযোগ নেই, আল্লাহ্ তা'লা একজন মু'মিনের জন্য পাঁচ বেলার নামায ফরয বা আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যাহোক এ কথা নিশ্চিত, যারা আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে যায় তারা পরিণতিতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে পর্যায়ে তাদের নৈতিক অধঃপতনও ঘটে আর আধ্যাত্মিক অধঃপতনও হয় আর পরিণতিতে তাদের মানসিক প্রশান্তিও হারিয়ে যায়। তারা মনে করে, জাগতিক কার্যকলাপেই তাদের কল্যাণ নিহিত। তাই এই

তাক্বওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে সর্বদা নিজেদের কাজ এবং নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। সবসময় খোদার কাছে তাঁর করুণা ভিক্ষা চাইতে থাকা আবশ্যক। সবসময় হৃদয়ে এই চিন্তা-চেতনা বিরাজমান থাকা উচিত, আমি আমার ঈমানকে কীভাবে নিরাপদ রাখতে পারি।

জাগতিক কাজ প্রথমে কর আর আল্লাহ্‌র অধিকার পরে দেয়া যাবে কেননা জাগতিক স্বার্থে তারা তাৎক্ষণিক আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য নিহিত বলে মনে করে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন, এমন লোকদের সাথে আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যবহার করেন, 'ফা আনসাহুম আনফুসাহুম'। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে নিজেদের বিষয়েই উদাসীন করে দিয়েছেন আর এমন মানুষ কখনো মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে না।

তাই আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে বলেছেন, যদি সত্যিকার তাক্বওয়া তোমাদের মাঝে থাকে আর তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক, আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তায় যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদে যদি ঈমান এবং বিশ্বাস থাকে তাহলে সেই সকল শর্ত মোতাবেক জীবন যাপন কর যার অধীনে জীবন যাপনের জন্য খোদা তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাহলো নিজেদের প্রতিটি কাজের পরিণাম দেখো। আর এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও, খোদা তা'লা তোমাদের প্রতিটি কথা এবং কাজ-কর্ম দেখছেন। আর যদি মানুষের চিন্তা-ভাবনা এমন হয়ে যায় তাহলে তার সকল কাজের ধরন এবং রীতিই বদলে যায়। তখন মানুষ নিজেই অনুভব করে, এ কারণে আমার ওপর খোদার ফযলের বা কৃপার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার মনে আছে যখন আমি কেনিয়া সফরে গিয়েছিলাম, সেখানে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদও উপস্থিত ছিলেন যিনি আমার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র সাথেও সাক্ষাত করেছি। তিনি আমাকে একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন যা মেনে চলায় আমার অনেক লাভ হয়েছে। সেই নসীহত ছিল এই, তুমি সকল কাজ করার পূর্বে চিন্তা করবে, খোদা তা'লা আমাকে দেখছেন আর তাঁর কাছে তোমার সকল কথা এবং কাজের রেকর্ডও রয়েছে।

এখন আমার মনে নেই, তিনি মুসলমান ছিলেন নাকি খ্রিষ্টান। খুব সম্ভব এই ব্যক্তি খ্রিষ্টান ছিলেন। যদি এ ব্যক্তি লাভবান হতে পারেন তাহলে একজন প্রকৃত মু'মিন কতটা লাভবান হতে পারবে যাকে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন, সে যদি কাজের পরিণামের ওপর দৃষ্টি রাখে আর সব সময় একথা স্মরণ রাখে যে, একজন সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাত খোদা আমার প্রতিটি কাজ এবং কর্মকে দেখছেন; তাই আমাকে আমার প্রতিটি কাজ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে? যদি এই চিন্তা-চেতনা না থাকে আর খোদা তা'লাকে যদি ভুলে যাও তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সেক্ষেত্রে দুষ্কৃতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা এখানে 'ফাসেক' শব্দ ব্যবহার করে ঈমানের দাবীদারদের সামনে এটি সুস্পষ্ট করেছেন, যদি তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত না হও, নিজের আগামী দিন সম্পর্কে চিন্তা না কর, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মেনে না চল তাহলে দুষ্কৃতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর দুষ্কৃতকারী হলো তারা যারা খোদা প্রদত্ত সীমা লঙ্ঘন করে, যারা পাপে নিমজ্জিত এবং লিপ্ত থাকে, যারা আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় এবং যারা সত্য থেকে দূরে সরে যায়। অতএব যদি আমরা আত্মবিশ্লেষণ না করি, আমাদের প্রতিটি কাজ খোদার নির্ধারিত মাপকাঠিতে যাচাইয়ের চেষ্টা না করি তাহলে সত্যিই গভীর চিন্তার বিষয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এই অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, এমন লোকদের মত হয়ো না যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'নাসুল্লাহা ফা আনসাহুম আনফুসাহুম, উলাইকা হুমুল ফাসিকুন' অর্থাৎ, যারা এই রহমত এবং পবিত্রতার উৎসস্থল মহা পবিত্র খোদাকে পরিত্যাগ করেছে আর নিজেদের দুস্কৃতি, ধূর্ততা এবং অপরিণামদর্শীতা এক কথায় হরেক প্রকার ষড়যন্ত্র এবং ধূর্ততা মাধ্যমে সফল হতে চায় অর্থাৎ শেয়ালের মত চালাকির মাধ্যমে তারা সফলতা হস্তগত করতে চায়। উর্দূতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে, শেয়ালের মত ধূর্ত, সেই শব্দ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি (রা.) আরো বলেন, মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। অনেক অভাব এবং চাহিদা মানুষকে পূরণ করতে হয়। সে খাদ্য-পানীয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। বন্ধু-বান্ধবও থাকে আবার শত্রুও থাকে। কিন্তু এসব পরিস্থিতিতে মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য হলো, সে এই কথার ওপর দৃষ্টি রাখে যে খোদার সাথে যেন সম্পর্ক নষ্ট না হয় অর্থাৎ, আল্লাহ্‌কে সবসময় স্মরণ রাখে আর খোদা তা'লাকে বন্ধু-বান্ধব এবং সকল কল্যাণকর বিষয়ের ওপর সে অগ্রগণ্য মনে করে।

তিনি আরো বলেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সে যদি কোন বন্ধুর ওপর নির্ভর করে থাকে তাহলে হতে পারে সমস্যা আসার পূর্বেই সেই বন্ধু পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে বা অন্য কোন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে হয়তো তার কোন সাহায্যে আসার মত কোন যোগ্যতাই আর থাকবে না। কোন বিচারকের ওপর যদি সে ভরসা করে থাকে তাহলে হয়ত বিচারকের বদলি হয়ে যাবে এবং সেই উপকার সে আর লাভ করতে পারবে না। আর সেসব বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজন যাদের কাছে তার সাহায্যের প্রত্যাশা থাকে এবং যাদের ওপর পূর্ণ ভরসা থাকে, তারা দুঃখ-কষ্টের সময় আমাকে সাহায্য করবে, প্রয়োজনের সময় আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এত দূরে সরিয়ে দিতে পারেন যে, তারা আর কোন কাজেই আসতে পারে না। তাই কখনো খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয় যিনি জীবন-মৃত্যুতেও আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন না। জীবন-মৃত্যুতে কেবলমাত্র খোদা তা'লাই সঙ্গ দেন।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সেসব লোকদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এরফলে তোমরা দুঃখ-বেদনা থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে না আর শান্তিও পাবে না বরং সকল অর্থে লাঞ্ছনার শিকার হবে। আর এমনও হতে পারে, তোমাদের বন্ধুদের পক্ষ থেকেই সেই লাঞ্ছনা আসবে। এমন মানুষ যারা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা কারা? তারা পাপাচারী ও দূরাচারী হয়ে থাকে। তাদের মাঝে সত্যিকার ঈমান থাকে না। কেবল এমন নয় যে, তারা ঈমানের ক্ষেত্রেই দুর্বল বরং আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির জন্য তাদের হৃদয়ে কোন ভালবাসাও থাকে না। খোদার সৃষ্টির প্রতি তারা ভালবাসা প্রদর্শন করে না। অর্থাৎ, তারা খোদার প্রাপ্য অধিকারও প্রদান করে না আর বান্দাদের প্রাপ্যও তাদেরকে দেয় না। অতএব আমাদের সবাইকে নিজেদের প্রতিটি কর্ম খোদার নির্দেশের অধিনস্ত করার চেষ্টা করা উচিত। নিজেদের সাময়িক স্বার্থের পরিবর্তে ভবিষ্যৎ বা আগামী দিনের ওপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালা-এ-আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

আক্ষেপের বিষয় যে, আমাদের জাতির লোক রূপক বিষয় ও বর্ণনাকে বাস্তব ঘটনা বলে ধরে নিয়ে কঠিন সব পেঁচে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। আর এতে করে এমন জটিল সংকটাবলীর সম্মুখীন হয়ে আছেন যে এখন সেগুলো দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত বেরিয়ে আসার যে-সব পথ রয়েছে সেগুলোকে তাঁরা গ্রহণ করেন না। যেমন, সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত মসীহ্ যখন আকাশ থেকে অবতরণ করবেন তখন তাঁর পোষাক হলুদ রঙের হবে– এ শব্দগুলো থেকে বাহ্যিক পোষাক বলেই ধরে নেওয়া কতো অবান্তর ধারণা! হলুদ রঙের কাপড় পরার কোন কারণ জানা যায় না। কিন্তু এ শব্দগুলোকে কাশ্‌ফ তথা দিব্যদর্শন বা স্বপ্নের রূপকাশ্রিত বর্ণনা বলে নির্ধারণ করে দিব্যদর্শন ও স্বপ্নতত্ত্ববিদদের ভাবধারা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অনুযায়ী এর তা'বির (তত্ত্বগত ব্যাখ্যা) করতে চাইলে

হযরত ইমাম হুসায়নের 'মজলুমসুলভ' (অত্যাচারিত) জীবন যেহেতু খোদা তা'লার দৃষ্টিতে অনেক মাহাত্ম্য ও মূল্য রাখে এবং তাঁর শাহাদতের ঘটনা হযরত মসীহ্‌র ঘটনার সাথে এতো সাদৃশ্যপূর্ণ যে, খ্রিষ্টানদেরও এ সম্পর্কে অমত থাকতে পারে না। এ কারণে খোদা তা'লা অনাগত যুগের লোকদেরও এ ঘটনার মাহাত্ম্য এবং হযরত মসীহ্‌র সাথে তাঁর সাদৃশ্য সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত করতে চেয়েছেন। আর এ কারণেই দামেস্ক শব্দটি রূপকার্থে ধরা হয়েছে, যাতে পাঠকদের চোখের সামনে সে যুগটি এসে যায় যখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরা (পরম প্রিয়) দৌহিত্র ইমাম হুসেয়ন হযরত মসীহ্‌র মতো চরম পর্যায়ের অন্যায় ও নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে দামেস্কের হতভাগা নিষ্ঠুরদের অবরোধে আটকা পড়ে নিহত হন। অতএব যেখান থেকে এ রকম অন্যায় ও অত্যাচারমূলক আদেশ-নির্দেশ জারি হতো এবং যেখানে এ ধরনের পাষাণ হৃদয় ও তমাসাচ্ছন্ন মন-মানসিকতাসম্পন্ন লোকের উদ্ভব ঘটেছিল– সেই দামেস্ককেই চিহ্নিত করে আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারণ করলেন যে, এখন দামেস্ক-সদৃশ এ স্থানটি (তথা কাদিয়ান) ন্যায়নীতি ন্যায়বিচার ও ঈমান বিস্তারে কর্মতৎপরতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবে। কেননা অধিকাংশ নবীই জালেমদের আবাসস্থলেই আবির্ভূত হয়ে এসেছেন এবং খোদা তা'লা অভিশাপের জায়গাগুলোকেই বরকতময় ও আশিসযুক্ত স্থানে রূপান্তরিত করে এসেছেন। রূপকাশ্রিত এই বর্ণনাটি আল্লাহ্ তা'লা এজন্য অবলম্বন করেছেন যাতে পাঠক দু'টি উপকার লাভ করতে পারে। এক, মজলুম (অত্যাচারিত) ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহুর বেদনাত্মক শাহাদতের ঘটনাটির মাহাত্ম্য ও মর্যাদা যেন মানুষের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়, যে বেদনাত্মক ঘটনাটির সংবাদ দামেস্ক শব্দটিতে ভবিষ্যদ্বাণীরূপে ইঙ্গিতের ভাষায় পবিত্র হাদীসটিতে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মানুষ যাতে নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হয় যে, দামেস্কের অধিবাসীরা যেমন প্রকৃতপক্ষে ইহুদী ছিল না, কিন্তু ইহুদীদের মতো কাজ করেছিল (তাই ইহুদী সদৃশ ছিল)। তেমনি যে মসীহ্ অবতীর্ণ হবেন তিনিও প্রকৃতপক্ষে (পূর্বে আগত) মসীহ্ নন। বরং তিনি মসীহ্ (আ.)-এর রূহানী অবস্থার প্রতীক ও প্রতিচ্ছবি বটে। আর এ স্থলে যার অন্তরে হযরত ইমাম হুসায়ন সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্কে যথাযত মর্যাদাবোধ নেই, এমন ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেকেই আমার বর্ণনাকৃত দামেস্কের সাথে জড়িত এ বিশেষত্বটি সর্বত খোলা অন্তরে অবশ্যই গ্রহণ করে নেবেন। কেবল গ্রহণই করবেন না, বরং এ বিষয়বস্তুটিতে গভীর মনোনিবেশ করায় বস্তুত 'হাক্কুল একীন' তথা অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বাসের মাত্রায় উন্নীত হবেন। ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যে হযরত মসীহ্‌র সঙ্গে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে– এ-ও একটি দ্বিগুণ আকারে রূপকাশ্রিত বিষয়, যা আমি পরবর্তীতে বর্ণনা করবো।

এখন প্রথমে আমি বর্ণনা করতে চাই যে, খোদা তা'লা আমার ওপর প্রতিভাত করেছেন, এ কাদিয়ান ক্ষুদ্র জনপদটি দামেস্কের সাথে এ কারণে সাদৃশ্য রাখে যে এখানে বেশির ভাগই এজিদী স্বভাব-চরিত্রের মানুষ বসবাস করে। এটা স্পষ্ট যে, সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সামঞ্জস্যতা আবশ্যিক নয়। বরং প্রায়শ একটি সামান্য সাদৃশ্যের কারণে, বরং কেবল একটি আংশিক বিষয়ে পারস্পরিক সামঞ্জস্যের কারণে একটি বস্তুতে অন্যটির নাম প্রয়োগ করা হয়। যেমন একজন বীর পুরুষকে বাঘ বলে অভিহিত করা হয়। বলা হয়, সে একটি বাঘ। এমনটি আবশ্যিক মনে করা হয় না যে বাঘের ন্যায় তার থাবাও থাকবে। আর তেমনি শরীরে পশম এবং তার একটি লেজও থাকতে হবে। বরং কেবলমাত্র একটি গুণ- বীরত্বের দিক থেকে এরকম একটি নাম প্রয়োগ করা হয়। বস্তুত সাধারণভাবে সব রকম রূপকের ক্ষেত্রে এ নিয়মবিধিই (কার্যকর) রয়েছে। তাই খোদা তা'লা এ সাধারণ নিয়ম অনুসারেই এ কাদিয়ান পল্লীকে দামেস্কের সাদৃশ্যমূলক বলে সাব্যস্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কাদিয়ান সম্পর্কে আমার প্রতি এ ইলহামও (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হয়েছে ঃ 'উখরিজা মিনহু ইয়াজীদিইউন' অর্থাৎ এখানে এজিদী (স্বভাবসম্পন্ন) লোকদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন যদিও আমার এ দাবী নয় এবং খোদা তা'লাও এমন স্পষ্টাকারে আমার নিকট প্রকাশ করেন নি যে দামেস্কে 'মসীহ্-সদৃশ' কেউ সৃষ্টি হবেন না। বরং আমার দৃষ্টিতে এমনটি সম্ভব যে, ভবিষ্যতে কোনো সময়ে বিশেষভাবে দামেস্কেও

(চলমান টীকা

এর সঙ্গত ও যুক্তি গ্রাহ্য ব্যাখ্যা হবে, হযরত মসীহ্ তাঁর আবির্ভাবের সময় অর্থাৎ যখন তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবী করবেন তখন তিনি কিছুটা অসুস্থ হবেন– তাঁর স্বাস্থ্যগত অবস্থা তখন খুব একটা ভালো হবে না। কেননা তা'বির তথা স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত পুস্তকাবলী অনুযায়ী হলুদ রঙের পোষাক পরার এটাই তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা। এটা স্পষ্ট যে, কাশ্‌ফ ও স্বপ্ন জগতের এ ব্যাখ্যাটিই হলো অত্যন্ত সমীচীন, যথার্থ যুক্তিসঙ্গত ও সহজবোধ্য। কেননা স্বপ্নতত্ত্বের সর্বস্বীকৃত গ্রন্থাবলীতে পরিষ্কার লেখা আছে, কোনো ব্যক্তিকে স্বপ্নে বা কাশ্‌ফী অবস্থায় যদি হলুদ রঙের পোষাক পরা দেখা যায় তাহলে এর তা'বীর করা উচিত যে সে-ব্যক্তি অসুস্থ বা অসুস্থ হতে যাচ্ছে। হায়! তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ধর্মী রুচী অনুযায়ী আমাদের তফসীরকার ও হাদীসবিদগণ যদি (হাদীস বর্ণিত) উক্ত বাক্যের এ অর্থই করতেন অর্থাৎ বলতেন যে মসীহ্ আবির্ভূত হয়ে যখন তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার বিষয়টি জনগণের কাছে প্রকাশ করবেন, তখন তাঁর স্বাস্থ্যগত অবস্থা ভালো থাকবে না বরং নিশ্চয় তিনি কোনো রকম দৈহিক অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতায় ভুগবেন। আর এটি হবে তাঁর আবির্ভাবের জন্যে সৈনিক সুলভ বিশেষ পোষাকের মত একটি আলামত বা চিহ্ন স্বরূপ। এই তত্ত্বমূলক অর্থ করলে সেটি কত উত্তম ও তাৎপর্যপূর্ণ এবং সার্বিকভাবে সত্য ও যথার্থ হতো। কিন্তু আক্ষেপ! আমাদের উলামা তেমনটি করেন নি। বরং তাঁরা তাদের অতি সরলতা, অপরিপক্কতা ও ভুল ধারণার বশবর্তীতার কারণে হুবহু ইহুদীদের মতো অপেক্ষা করছেন যে সত্যি-সত্যি (সশরীরে) মসীহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন আর জাফরানে রঙীন করা হলুদ রঙের এক পোষাক তাঁর গায়ে পরা থাকবে। হায়! এ শ্রেণীর উলামার যদি কখনও এ রকম স্বপ্ন দেখারও অভিজ্ঞতা লাভ হয়ে থাকতো যে (স্বপ্নে) তারা হলুদ রঙের কাপড় পরে আছেন, এরপর তারা অসুখেও ভুগতেন তাহলে আজ তাদের দৃষ্টিতে আমার এ কথাগুলো কদর ও গ্রহণ করার যোগ্য বলে প্রতীয়মান হতো। কিন্তু

কোনো 'মসীহ্-সর্দশ' ব্যক্তি আবির্ভূত হতে পারেন। কিন্তু খোদা তা'লা অবশ্যই ভালো জানেন এবং তিনি এ ব্যাপারে সরাসরি সাক্ষী যে, তিনি দামেস্কের সাথে কাদিয়ানকে সাদৃশ্যমূলক সাব্যস্ত করেছেন এবং এ লোকদের সম্পর্কে বলেছেন, এরা এজিদী স্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ এখানে বসবাসকারীদের অধিকাংশ লোক স্বভাবচরিত্রে এজিদী লোকদের সদৃশ। এ ইলহামটিও অনেক কাল আগে অবতীর্ণ হয়েছে ঃ 'ইন্না আনযালনাহু ক্বারীবাম্মিনাল কাদিয়ান ওয়া বিল-হাক্কি আনযালনাহু ওয়া বিল হাক্কি নাযালা ওয়া কানা ওয়া'দুল্লাহি মাফ'উলা।' অর্থাৎ 'আমরা তাকে কাদিয়ানের কাছে অবতীর্ণ করেছি। সত্যতার মাধ্যমে (যথাযতভাবে) তাকে অবতীর্ণ করেছি। সত্যতার মাধ্যমে (যথাযতভাবে) সে অবতীর্ণ হয়েছে। আর একদিন আল্লাহ্‌র ওয়াদা পুরা হওয়া অবধারিতই ছিল।'

উক্ত 'ইলহাম'টিতে গভীর দৃষ্টিপাতে প্রতিভাত হয় যে খোদা তা'লা কর্তৃক কাদিয়ানে এ অধমের আবির্ভাব ঐশীবাণীমূলক লিপি মালায় পূর্বকাল থেকে লিপিবদ্ধ ছিল। এখন যেহেতু এর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কাদিয়ানকে দামেস্কের সাথে সাদৃশপূর্ণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, এতে করে স্পষ্টত কাদিয়ানের নাম পূর্ববর্তী ঐশী লিপিসমূহে রূপকভাবে দামেস্ক রেখে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা 'সেহাহে সিত্তার' কোন হাদীস গ্রন্থে অথবা কুরআন করীমে কাদিয়ানের নাম লেখা পাওয়া যায় না। আর 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে প্রকাশিত উক্ত ইলহাম তথা ঐশীবাণীটি অতি স্পষ্ট ভাষায় ও উচ্চৈস্বরে ব্যক্ত করছে যে কাদিয়ানের নাম কুরআন করীমে অথবা নবী করীম (সা.)-এর হাদীসাবলীতে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে অবশ্যই মওজুদ থাকবে। তবে যেহেতু মওজুদ নেই, সেহেতু এছাড়া আর কোন্ দিকে খেয়াল যেতে পারে যে খোদা তা'লা কাদিয়ানের নাম কুরআন করীমে অথবা পবিত্র হাদীসে ভিন্ন কোনো আকারে অবশ্যই উল্লেখ করে থাকবেন? আর এখন সদ্য অবতীর্ণ নতুন একটি ইলহাম দ্বারা এ বিষয়টি যেহেতু প্রমাণসিদ্ধ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, কাদিয়ান খোদা তা'লার দৃষ্টিতে দামেস্কের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বটে। এতে করে পূর্বে অবতীর্ণ ইলহামের অর্থও স্পষ্টত উন্মোচিত হলো। অন্য কথায়, এ অধমের অন্তরে ইলহামী তথা ঐশীবাণীরূপে আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ 'ইন্না আনযালনাহু ক্বারীবাম্ মিনাল কাদিয়ান'– এ বাক্যটির তফসীর (ব্যাখ্যা) হলো নিম্নরূপ ঃ–

'ইন্না আনযালনাহু ক্বারীবাম্ মিন দামেস্ক বিতারফিন শারকীয়িন ইন্দাল্ মিনারাতিল বাইযায়ি (অর্থ ঃ নিশ্চয় আমরা তাকে দামেস্কের নিকটে পূর্ব কিনারায় শুভ্র মিনারার কাছে 'অবতীর্ণ করেছি'– অনুবাদক)। কেননা অধমের বাস- ভবনটি হচ্ছে কাদিয়ানের পূর্ব কিনারায় মিনারের কাছে অবস্থিত। কাজেই 'কানা ওয়া'দুল্লাহি মাফ্‌উলা' (অর্থ ঃ এ প্রতিশ্রুতি পুরা হওয়া অবধারিতই ছিল –অনুবাদক) ইলহামের এ বাক্যটির উল্লিখিত ব্যাখ্যার সাথে সমন্বয় সাধিত হয়ে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি বস্তুতঃপক্ষে পূর্ণতা লাভ করেছে।

এ বাক্যটিতে উপনীত হলে এ অধমের প্রতি নিম্নরূপ ইলহাম (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হয় ঃ "কুল্‌লাও কানাল আমরু মিন ইন্দি গাইরিল্লাহি লা-ওয়াজাদতুম ফিহি ইখ্‌তিলাফান কাসীরা। কুল্‌লাও ইত্তাবাআল্লাহু আহ্‌ওয়াকুম লা-ফাসাদাতিস্ সামাওয়াতু ওয়াল আরযু ওয়া মান ফিহিন্না ওয়া লা-বাতালাত্ হিক্‌মাতুহু ওয়া কানাল্লাহু আযীযান হাকীমা। কুল্‌লাও কানাল্ বাহরু মিদাদাল্লিকালিমাতি রাব্বি লা-নাফিদাল্ বাহ্‌রু কাবলা আন তান্‌ফদা কলিমাতু রাব্বি ওয়ালাও জি'না বিমিস্‌লিহী মিদাদা। কুল্ ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহ্‌বিব্‌কুমুল্লাহ্, ওয়া কানাল্লাহু গাফূরার রাহীমা।"

(অর্থ ঃ এ বিষয়টি যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নিকট থেকে এসে থাকতো তাহলে এর মধ্যে তারা অনেক স্ববিরোধ ও অসংগতি দেখতে পেতো। বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করতেন তাহলে আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে তা সবই বিশৃঙ্খল ও এলোমেলো হয়ে পড়তো এবং তাঁর হিক্‌মত (প্রজ্ঞা) বৃথা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হতো। বস্তুত আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাবান। বল, আমার প্রভুর বাণীসমূহ লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়ে যেতো, তাহলে আমার প্রভুর বাণীসমূহ নিঃশেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র ফুরিয়ে যেতো। যদি আমরা অনুরূপ আরও কালি উপস্থিত করতাম তবুও। বল, আল্লাহ্‌কে যদি তোমরা ভালোবাস তা'হলে আমার অনুবর্তিতা কর। (তাহলে) আল্লাহ্ তোমাদেরও ভালোবাসবেন। বস্তুত আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় ও বার বার কৃপাকারী" –অনুবাদক)।

এরপর আরও 'ইলহাম' (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হলো ঃ "ইন উলামা নে মেরে ঘর কো বাদাল ডালা। মেরি ইবাদত্‌গাহ্ মেঁ উনকে চুল্‌হে হ্যাঁ। মেরি পরিস্‌তিশ্ কি জাগাহ্ মেঁ উনকে পেয়ালে আওর ঠুটিয়াঁ রাখ্‌খি হুই হ্যাঁ আওর চুহৌ কি তারাহ্ মেরে নবী কি হাদীসোঁ কো কুতার রহে হ্যাঁ।" (অর্থ ঃ এই আলেম-উলামা আমার ঘরকে বদলে ফেলেছে। আমার উপাসনালয়ে রয়েছে তাদের চুলো। আমার ইবাদত করার জায়গাতে (তারা) তাদের বাটি-খুরি রেখে দিয়েছে এবং ইঁদুরের মতো আমার নবীর হাদীসসমূহকে কেটে কুটি কুটি করছে–অনুবাদক)। (ইলহামের ভাষ্যটিতে উল্লেখিত) 'ঠুঠিয়াঁ' হলো সেই সব ছোট কটোরা যেগুলোকে (ভারতের) উত্তর প্রদেশে 'সকুরিয়া' বলা হয়। 'ইবাদতগাহ্' দ্বারা উক্ত ইলহামে বর্তমান যুগের অধিকাংশ মৌলবিদের অন্তর বুঝায়, যা সংসারাসক্তি দিয়ে ভরে রয়েছে।

(চলমান টীকা

মুশকিল তো হচ্ছে এই যে, রূহানী (তথা আধ্যাত্মিক) অঙ্গণে বিচরণের তাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই–যেন এতে তাদের প্রবেশাধিকারই নেই। তাই তো ইহুদী আলেম-উলামার মতো প্রত্যেক বিষয়কে তারা আক্ষরিক আকারে ঢেলে দৈহিক রূপ দিতে থাকেন। কিন্তু অপর একটি শ্রেণীও রয়েছে যাদের আল্লাহ্ তা'লা সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ দান করেছেন– তাঁরা আসমানী (আধ্যাত্মিক) বিষয়াদিকে আসমানী প্রাকৃতিক নিয়মে অনুধাবন করতে চান এবং তারা 'ইস্তিআরা' ও 'মাজায' তথা রূপক অর্থ ও রূপকাশ্রিত বর্ণনার যথার্থতা স্বীকার করেন। কিন্তু আফসোস! তারা সংখ্যায় খুবই কম। আকসার (বেশির ভাগ) এ জাতীয় লোকই আমাদের জাতির মাঝে বিপুলভাবে ছড়িয়ে রয়েছেন, যাঁরা স্থূল ধ্যান-ধারণা এবং আক্ষরিক অর্থ গ্রহণেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। মোটেই বোঝেন না, তাঁর ওহী ইলহাম ও কাশ্‌ফ সম্পর্কিত প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন স্বতঃস্পষ্টভাবে তাদের ধ্যান-ধারণার বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে। শত-সহস্রবার স্বপ্নে দেখানো হচ্ছে যে, একটি জিনিস দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে সেটি বোঝায় অন্য কোনো এক জিনিস। মানুষ (স্বপ্নে) এক ব্যক্তিকে আসতে দেখে এরপর সকালে তার সদৃশ বা অনুরূপ অন্য কেউ এসে যায়। (চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অবঃ)

এ স্থলে আমার স্মরণ হলো, যে-দিন 'কাদিয়ানে নাযেল হওয়ার' বিষয় যুক্ত ইলহামটি অবতীর্ণ হয়েছিল সেদিন কাশ্‌ফ তথা দিব্যদর্শনে আমি দেখি যে আমার ভাই সাহেব মরহুম মির্যা গোলাম কাদের আমার কাছে বসে উঁচু আওয়াজে পবিত্র কুরআন পাঠ করছেন এবং পড়তে পড়তে তিনি এ বাক্যগুলো পাঠ করলেন ঃ 'ইন্না আনযালনাহু ক্বারীবাম মিনাল কাদিয়ান'। তা শুনে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম, কাদিয়ানের নাম কি কুরআন করীমেও লেখা আছে! তখন তিনি বললেন, 'এই দেখ লেখা আছে।' তখনই আমি তাকিয়ে দেখলাম। জানতে পারলাম, কুরআন করীমের ডান দিকের একটি পাতায় এর প্রায় অর্ধভাগে ইলহামযোগে অবতীর্ণ এ বাক্যটি লেখা রয়েছে। তখন আমি আপন অন্তরে বল্‌লাম, হ্যাঁ সত্যসত্যিই কাদিয়ানের নাম কুরআন শরীফে লেখা আছে। আর আমি বল্‌লাম, 'তিনটি শহরের নাম সম্মানসূচকরূপে কুরআন শরীফে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে–মক্কা ও মদীনা এবং কাদিয়ান'। এ (বৃত্তান্তটি) ছিল কাশ্‌ফ তথা দিব্যদর্শন। যা কয়েক বছর হলো আমাকে দেখানো হয়েছিল। এ কাশফটিতে আমি যে কয়েক বছর আগে আমার পরলোকগত ভাই সাহেবকে কুরআন শরীফ পড়তে দেখলাম এবং (আমার প্রতি অবতীর্ণ) এ ইলহামী বাক্যটি তাঁর মুখে কুরআন করীমে পাঠ করতে শুনলাম– এতে যে গোপন রহস্য নিহিত রয়েছে সেটি খোদা তা'লা আমার ওপর প্রকাশ করলেন যে, তাঁর নামের সাথে এ কাশ্‌ফের তা'বীর তথা ব্যাখ্যার নিবীড় সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ তার নামটিতে যে 'কাদের' শব্দ রয়েছে এ শব্দটি কাশ্‌ফীভাবে উপস্থাপন করে এ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ হচ্ছে 'কাদের মুতলাক' – সর্বশক্তিমান খোদা তা'লার কাজ। এতে মোটেও বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। তাঁর কুদরতের বিস্ময়কর বিষয়াদি এমনি ধারায় চিরকাল প্রকাশিত হয়ে থাকে যে তিনি দরিদ্র ও দুর্বলদের সম্মান ও মর্যাদা দান করেন এবং বড় বড় সম্মানিত ও মর্যাদাবান লোকদের মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। বড় বড় উলামা ও অতি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ তাঁর কল্যাণ প্রবাহের দরবার থেকে সম্পূর্ণ বে-নসীব ও বঞ্চিত হয়ে যায়। আর একজন তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের পাত্র নিরক্ষর, অজ্ঞ, অক্ষম ও অযোগ্য ব্যক্তি ঐশী মনোনয়নে সম্মানিত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীতদের দলভুক্ত হয়ে থাকেন। চিরকাল থেকে এমনটিই তাঁর স্বভাব ও রীতিনীতি বলবৎ রয়েছে। আবহমান কাল থেকে তিনি এমনটিই করে এসেছেন। "ওয়া যালিকা ফায্‌লুল্লাহি ইউতিহি মাঁইয়াশাউ" (এটি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ। এ দ্বারা যাকে ইচ্ছা তিনি ভূষিত করে থাকেন–অনুবাদক)।

(চলবে)

আসন্ন রমযান মাসে ওয়াক্‌ফে জাদীদের ২০১৫ সনের চাঁদা আদায় প্রসঙ্গে

আপনারা অবগত আছেন যে, হুযূর (আই.) সকল আহমদীকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের ওয়াদায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং হুযূর (আই.) এর দপ্তর থেকে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও তাগিদ করেছেন, চাঁদার ওয়াদা যাতে পূর্বের চেয়ে বেশী করা হয় এবং প্রত্যেক জামা'ত এর অংশগ্রহণকারীর সদস্য সংখ্যা নওমোবাঈন সহ ১০০% পূর্ণ হয়। সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, আসন্ন রমযান মাসে ওয়াকফে জাদীদ চাঁদা আদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিবেন যাতে ১০০% ওয়াকফে জাদীদ চাঁদা আদায় হয়ে যায় এবং উক্ত চাঁদা আদায়ের রিপোর্ট আগামী ২৫ রমযানের মধ্যে ন্যাশনাল আমীর সাহেব এর দপ্তরে পাঠিয়ে দিবেন। কেননা প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও ওয়াক্‌ফে জাদীদ চাঁদা আদায়কারীর নামের তালিকা হুযূর আকদাস (আই.) এর দপ্তরে দোয়ার জন্য প্রেরণ করা হবে।

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যেন আমরা আমাদের প্রাণ-প্রিয় হুযূরের দোয়ার বরকতের অংশীদার হতে পারি।

শহীদুল ইসলাম বাবুল
সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ
মোবা : ০১৭১৪-০৮৫০৭০, ০১৭৩০০২৮৫৭৬

পবিত্র মাহে রমযানের ফিতরানা ও ফিদিয়ার হার

১। এ বছর ফিতরানা ধার্য হয়েছে ১০০/- (একশত) টাকা। প্রত্যেকের জন্য এমনকি নবজাতক শিশুর জন্যও ফিতরানা প্রদান করা আবশ্যকীয়। যারা অসচ্ছল তারা অর্ধেক হারে ফিতরানা প্রদান করতে পারেন।

২। যারা একান্ত অপারগতার জন্য রোযা রাখতে পারবেন না তারা অবশ্যই ফিদিয়া প্রদান করবেন। এ বছর শহরের জামা'তের জন্য নূন্যতম ফিদিয়ার হার ১৫০০/– (একহাজার পাঁচ শত) টাকা এবং গ্রামের জামা'তের জন্য নূন্যতম ফিদিয়ার হার ১২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা ধার্য করা হয়েছে। যারা সামর্থ্যবান তারা রোযা রাখা সত্ত্বেও ফিদিয়া প্রদান করতে পারেন।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী তরবিয়ত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৩২)

প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মের পর্যালোচনাঃ আহমদীয়া জামা'তের দৃষ্টিতে

(১) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেনঃ

"জানা আবশ্যক, বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাবলী থেকে বহুবিধ তথ্য প্রমাণ আমার হস্তগত হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য করলে সুনিশ্চিত জানা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) অবশ্যই পাঞ্জাব ও কাশ্মীর ইত্যাদি অঞ্চলে এসেছিলেন। এ সাক্ষ্য–প্রমাণগুলো আমি নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি, যাতে প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এগুলো প্রথমে গভীর মনোনিবেশে পাঠ করেন। এরপর এগুলোকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করে তাঁরা নিজেরাই উল্লেখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন। এগুলো হচ্ছেঃ প্রথমতঃ গৌতম বুদ্ধ এবং হযরত ঈসাকে দেয়া উপাধিগুলো হুবহু একই রকম। তেমনিভাবে তাদের উভয়ের জীবনের ঘটনাবলী পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে বৌদ্ধধর্ম বলতে তিব্বতের সীমারেখায় অর্থাৎ লেহ, লাহসা, গিলগিত ও হামস ইত্যাদি অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মকে বুঝায়। এসব জায়গায় হযরত ঈসা (আ.) গিয়েছিলেন বলে প্রমাণিত। উপাধিগুলোতে সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে এ প্রমাণই যথেষ্ট, যেমন হযরত ঈসা (আ.) তাঁর শিক্ষায় নিজেকে নূর (জ্যোতিঃ) বলে অভিহিত করেছেন। তেমনি গৌতমকে 'বুদ্ধ' আখ্যা দেয়া হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় এ শব্দটির দ্বারা জ্যোতিঃ বুঝায়। ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ.)–এর একটি উপাধি হলো 'শিক্ষক'। তেমনি গৌতম বুদ্ধের একটি উপাধি হচ্ছে 'শাস্তা' বা শিক্ষক। যেভাবে ইঞ্জিলে হযরত মসীহকে আশিসমন্ডিত বলা হয়েছে, তেমনি গৌতম বুদ্ধকেও 'সগ্‌ত' বা আশিসমন্ডিত বলা হয়েছে। আর যেমন হযরত মসীহকে শাহজাদা (যুবরাজ) বলে অভিহিত করা হয়েছে, তেমনি বুদ্ধকেও যুবরাজ নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ.)–কে এ অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হবেন। তেমনি বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাদিতে গৌতম বুদ্ধের একটি উপাধি হচ্ছে 'সিদ্ধার্থ' অর্থাৎ তিনি তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যে সফল হয়েছেন। ইঞ্জিলে হযরত মসীহকে 'ক্লান্ত–শ্রান্তদের আ শ্রয়দাতা' বলা হয়েছে। তেমনি বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাদিতে গৌতম বুদ্ধের একটি উপাধি হচ্ছে 'আশ্রণ সরণ' অর্থাৎ নিরা শ্রয়দেরকে আশ্রয়দানকারী। ইঞ্জিলে হযরত মসীহ (আ.) বাদশাহ বলেও অভিহিত হয়েছেন যদিও তিনি এর দ্বারা আধ্যা ত্মক রাজত্বকে বুঝিয়েছেন। তেমনি গৌতম বুদ্ধকেও বাদশাহ বলা হয়েছে।" (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ 'মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ' নামক পুস্তক)।

(২) বুদ্ধ এবং যিশুর মধ্যে সাদৃশ্য :

" Buddha and Jesus were both holy prophets of God who appeared in their own times for the spiritual rejuvenation of the people to whom they were sent. Buddha appeared in India about six hundred years before Jesus. In both were found a purity of life, sanctity of character and patient endurance under fierce persecution. It appears that they were both very near in resemblance as suggested by the following analogies.

1. Jesus was born of a virgin without carnal intercourse. (Matth. Chapter 1)

Buddha was born of a virgin without carnal intercourse.

(Hinduism by Williams. pp 82 and 108)

2. When Jesus was an infant in his cradle, he spoke to his mother and said:

I am Jesus, the son of God. (Gospel of Infancy)

When Buddha was an infant, just born, he spoke to his mother, and said:

I am the greatest among men. (Hardy's Manual of Buddhism. p145-6)

3. The life of Jesus was threatened by King Herod. (Matth. 2:1)

The life of Buddha was threatened by king Bimbarasa.

(History of Buddha by Beal pp 103-104)

4. When Jesus was a young boy we are told that the learned religious

teachers were astonished at his understanding and answers. (Luke 2:47)

When sent to school, the young Buddha surprised his masters. (Hardy's Manual of Buddhism)

5. Jesus fasted for forty days and nights. (Math. 4:2)

Buddha fasted for a long period. (Science of Religion by Muller, pp28)

6. It is believed that Jesus will return to this world. (Acts. 1:11)

It is believed that Buddha will return to this world. (Angel-Messiah by Bunsen, Ch. 14)

7. Jesus said: *Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy but to fulfill.* (Matth. 5:17)

Buddha came not to destroy the law but to fulfill it. (Science of Religion by Muller. pp140)

8. Jesus said: *Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you.* (Matth. 5:44)

(৩) বৌদ্ধ–ধর্মে নাস্তিকতার ধারণাঃ

(ক) হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেনঃ

"আর এই অভিযোগ যে, বুদ্ধ খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না তা নিছক মিথ্যা। বরং বুদ্ধ প্রচলিত বেদ এবং হিন্দুদের শরীরি খোদাগুলোকে অস্বীকার করেন। নিঃসন্দেহে তিনি বেদের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বর্তমান বেদকে সত্য বলে স্বীকার করেন না। তিনি বেদকে এক বিকৃত, প্রক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত গ্রন্থ বলে মনে করেন। যে যুগে তিনি একজন হিন্দু হিসেবে বেদের অনুসারী ছিলেন সেই যুগে তাঁর জন্মকে তিনি কুজন্ম বলে আখ্যায়িত করেন। সূতরাং তিনি রূপকের ভাষায় এবং ঈশারায়–ইঙ্গিতে বলেন, 'আমি এক সময় পর্যন্ত হাতী ছিলাম, তারপর হরিণে পরিনত হই।'...তিনি আরো বলেন, 'একবার আমি ভূত হয়ে যাই, একবার নারী এবং একবার নৃত্যকারী শয়তান হয়ে যাই,এই সব ইশারা–ইঙ্গিত দ্বারা তিনি তাঁর জীবনের সেসব অবস্থাকে বুঝিয়ে দেন যা কাপুরুষতা, মেয়েলী আচার–আচরণ, অপবিত্রতা, হিংস্রতা, বিলাসিতা ও অতিভোজন–প্রিয়তা এবং কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এভাবে তিনি তাঁর সেই সময়ের অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যখন তিনি বেদের একজন অনুসারী–ছিলেন। কেননা বেদকে পরিত্যাগ করার পর এদিকে তিনি আর কখনও ইঙ্গিত করেন নি যে, তারপরও তাঁর মানে অপবিত্র জীবনের কোন অংশ থেকে গিয়েছিল। বরং তারপর তিনি বলেন যে, তিনি খোদা তা'লার প্রকাশ–স্থলে পরিণত হয়েছেন,নির্বান লাভ করেছেন।" [মসীহ হিন্দুস্তান মে; পৃ–৮২-৮৩]

(খ) হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে মীর্যা তাহের আহমদ (রাহ.) বলেনঃ

"বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বিশ্বে সাধারণ যে ধারণাটি প্রচলিত আছে, তা হচ্ছে, এটা জীবনের এমন এক দর্শন, যা ধর্মের মধ্যে পরিগণিত হলেও খোদার অস্তিত্ব মেনে নেয় না। তবে ধারণাটি কেবল আংশিক সত্য। সমসাময়িক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কোন একজনও , এক বা একাধিক কোন 'খোদাতে' বিশ্বাস করে না। বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য পূর্ণ গোত্রগুলোর মধ্যে মহাযান ও হীনযান অর্থাৎ থেরাভাদিনরা এমন অনেক কুসংস্কার ও ভৌতিক-মূর্তিতে বিশ্বাস করে, যেটাকে তারা তাদের জন্যে খোদার পরিবর্তে গ্রহণ করে থাকে। প্রকৃত পক্ষে অন্য যেকোন স্বর্গীয়ভাবে নাযেলকৃত ধর্মের মতই খোদার একত্বের ওপর জোর দিয়েই বৌদ্ধধর্মের শুরুটা হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বুদ্ধের (খৃঃপূঃ ৫৬৩-৪৮৩) অবস্থানটি এমন যে, যদিও তিনি সরাসরি দেবতা হিসেবে পূজিত হন না, তথাপি বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যান্য ধর্মে খোদাকে উপসনা করার প্রচলিত–পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য সামান্যই পরিলক্ষিত হয়।

...আসলে অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা খোদাকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও কোন কিছুকে পূজা করার বাসনা তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে ওত পেতে থাকে। আর এটা থেকেই বুদ্ধের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার প্রকাশ পেয়ে থাকে। খোদার জন্যে মানবাত্মার গভীরে প্রোথিত একই সহজাত অদম্য তৃষ্ণা তাদেরকে তাঁর অথবা তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতে অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং এই শূণ্যতা পূরণ করতেই বৌদ্ধরা বুদ্ধকে খোদা হিসেবে চিহ্নিত না করেও তার পূজা করে থাকে। এখানে এটাও উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধধর্মের প্রচলিত তিব্বতি–প্রথায় অতিমানবীয় দেব–দেবী অথবা দৈত্য–দানব অস্তিত্বকে তারা কেবল তাদের ধর্ম–বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই মানে না, এগুলোর সাথে তাদের যোগাযোগ থাকার কথাও তারা আবশ্যিকভাবেই বিশ্বাস করে।...

বৌদ্ধদের দর্শন, শিক্ষা ও অনুশীলনাদি বুদ্ধের প্রায় পাঁচশত বছর পর সম্রাট অশোকের (খৃঃ পূঃ ২৭৩-২২৩) সুবিখ্যাত শাসনামলে শিলা ও বস্তখন্ডে খচিত হবার আগ–পর্যন্ত সময়কালে শুধুমাত্র 'শ্রুত কথা'–য় ক্রমান্বয়ে মৌখিকভাবে চালান হতে থাকে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অশোকের আবির্ভাব হয় তার আধ্যাত্মিক গুরু বুদ্ধ–এর আগমনের প্রায় তিনশত বছর পরে।...

যখন বৌদ্ধ ধর্মের কোন কিছু লিখিত আকারে বিদ্যমান ছিলনা, সে সময় একমাত্র অশোক–ই ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব, যিনি বুদ্ধের শিক্ষা সমূহ যতটা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, তা লিখিত আকারে রেখে যান।...বুদ্ধের জীবনী ও বস্ত্র লিখন থেকে বুদ্ধের জীবনী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, তিনি খোদার অন্যান্য নবী, যারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাদের থেকে ভিন্ন ধরণের কেউ ছিলেন না। নবীদের চরিত্র ও রীতির বিষয়ে এক বিশ্বব্যাপী সার্বজনীনতা বিদ্যমান, যেটা বুদ্ধের জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক-বিশ্বাসগুলো বিচার করলে দেখা যায় যে, তিনি কী বলেছেন অথবা করেছেন, সেটার ব্যাখ্যার ভিন্নতা থেকে সমস্যাগুলো শুরু হয়েছে। বুদ্ধের নাস্তিক হওয়ার বহুলভাবে সমর্থিত ধারণার সাথে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি।

আমরা মনে করি যে, বৌদ্ধধর্ম ছিল স্বর্গীয়ভাবে নাযেলকৃত একটি ধর্ম। আমরা এ সত্যের ওপর জোর দেই যে, যিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কোন নাস্তিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বয়ং খোদা কর্তৃক মনোনীত এক ব্যক্তি, যাকে অন্যান্য রাসূলদের রীতিতে খোদা তাঁর বাণী প্রচার করার জন্য দাঁড় করিয়েছিলেন।....

আমরা আবারো বলি যে, ধর্মসমূহের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম কোন অদ্ভুত ধর্ম নয়। অপরপক্ষে, এর মৌলিক দিকগুলো অন্যান্য ঐশী ধর্মের মৌলিক দিকগুলোর সাথে সম্পুর্ণভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। বৌদ্ধধর্মের খোদাবিহীন–উৎপত্তি জনিত ত্রুটিপূর্ণ জনপ্রিয় বিশ্বাসটি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমা পন্ডিতদের দ্বারা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের বড় ভিত্তিটি ছিল পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ–সাহিত্যের বৌদ্ধ পন্ডিতদের কৃত অনুবাদ সমূহ , যারা তাদের অনুবাদে নিজস্ব পক্ষপাত মূলক খোদাহীন–দর্শনের প্রভাব খাটিয়েছিল। তাদের মধ্যে অল্প কজনই পালি ভাষা বুঝেছিল, যেটি ছিল উৎস–উপাদানের ভাষা। উপরন্তু, বিশ্বস্ত কোন বৌদ্ধ সূত্র থেকে অধ্যয়ন করে সরাসরি তার ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বদলে তারা সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ-উপদলের মধ্যে প্রচলিত-বিশ্বাস সমূহের ওপর সম্পুর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ে।

পশ্চিমা পন্ডিতদের এই সাধারণ প্রবণতার বিপরীতে ভারতবর্ষের কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (১৮৩৫-১৯০৮) (আ.) কর্তৃক অদ্বিতীয় একটি ধ্বনি উচ্চারিত হয়, যিনি এর বিপরীতে এক ভিন্ন-মত উপস্থাপন করেন। তিনি এ মত পোষণ করেন যে, খোদার অস্তিত্বের বিষয়ে বুদ্ধের স্থির-বিশ্বাস ছিল, খোদা নিজেই তাকে তাঁর রাসুল হিসেবে এক সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্যে দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, খোদার অন্যান্য নবীর মত বুদ্ধ (আ.) নিজেও শয়তান, বেহেশ্‌ত ও দোযখ্‌ ফেরেশতা ও পূণরুত্থান দিবসের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। এমতাবস্থায়, বুদ্ধ (আ.) এর বিরুদ্ধে আরোপিত খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করার অভিযোগটি সম্পুর্ণ মিথ্যা। বুদ্ধ (আ.) যে বিষয়টি নাকচ করেছিলেন, সেটা হলো, 'বেদান্ত' অর্থাৎ হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ 'বেদ' এর মতবাদ ও বিশ্বাস সমূহ। হিন্দু-ধর্মে বর্নিত দেবতাদের দৈহিক-প্রকাশের বিশ্বাসকে তিনি নাকচ করেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণদের কঠোর সমালোচক এবং তাদেরকে তিনি বিকৃত-ব্যাখ্যা উপস্থাপনকারী সাব্যস্ত করে 'ঐশী শিক্ষার দূষণ-কারী' হিসেবে চিহ্নিত করেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর এই উচ্চারণ দীর্ঘদিন অসমর্থিত থাকে নি। শীঘ্রই বৌদ্ধধর্ম নিয়ে পশ্চিমা পন্ডিত ও গবেষকদের দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্য থেকে আরো অনেকের অভিমত তাঁর মতের অনুসরণে প্রবৃত্ত হলো। তাদের মধ্যে সবচে' প্রসিদ্ধ ছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত পন্ডিত ড. গুস্তাভ লী ব'ণ (১৮৪১–১৯৩১), যিনি লিখেনঃ দুর্ভাগ্যক্রমে ইউরোপীয় পন্ডিতদের দ্বারা ভারতীয় ঐতিহাসিক দলিলাদির সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্পুর্ণরূপে অবহেলিত হয়েছে। 'ইন্ডিয়ান স্টাডিজ'-এর বিশেষজ্ঞরা, যাদের মাধ্যমে আমরা বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়েছি, তারা কখনো ভারতবর্ষ সফর করেন নি। তারা শুধু পুস্তকাদি থেকেই এই ধর্ম সম্পর্কে জেনেছেন। নিয়তির এক দুঃখজনক আবর্তণ তাদেরকে বুদ্ধের তিরোধানের পাঁচ অথবা ছয় শতাব্দী পরে দার্শনিক গোত্র সমূহের লিখিত রচনা পাঠের সুযোগ এনে দেয়, যেগুলো ছিল বাস্তবে অনুশীলিত ধর্মের সাথে সম্পুর্ণ বেমানান। রূপকধর্মী চিন্তা-চেতনা সমুহ, যেগুলো ইউরোপীয়দেরকে এতো গভীরভাবে চমৎকৃত করেছিল, সেটা আসলেই নূতন কিছুই ছিলনা। ভারতীয় পুস্তকাদি সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হবার পর থেকেই এগুলো দার্শনিক সম্প্রদায় সমূহের কিতাবাদিতে পরিলক্ষিত হয়েছে, যারা ব্রাহ্মণীয় যুগে বিকাশ লাভ করেছিল।"....

ড. লী ব'ণ-এর পর আর্থার লিলি নামক আরেকজন খ্যাতিমান পন্ডিত অশোকের বস্ত্রলিখনের সযত্ন অধ্যয়ন থেকে তাঁর প্রণীত গ্রন্থ '***ইন্ডিয়া ইন প্রিমিটিভ খ্রীষ্টানিটী***'–তে যথেষ্ট সংখ্যক উদ্ধৃতি দেন। উল্লেখ্য যে, স্মৃতিলিপির এ উদ্ধৃতিগুলো শুধুমাত্র তৈরী বস্ত্র খন্ডেই অন্তর্লিখনরূপে নির্দিষ্টভাবে উৎকীর্ণ ছিলনা, বরং জনপদসমূহে এবং বাণিজ্যিক এলাকাতে স্থাপিত বিশালাকৃতির শিলার গায়েও সেগুলো আবিস্কৃত হয়েছে। আমরা নিম্নে লিলি'র করা অনুবাদ থেকে এধরণের অন্তর্লিখনের দু'টো উদাহরণ উপস্থাপন করছি।

'জগন্নাথ থেকে বিশ মাইল দুরে কটক নদীর পূর্ব পারে পারদহলি নামক একটি শিলাখণ্ড রয়েছে, যার উপর লিখিত আছেঃ 'ইহজাগতিক সামগ্রীর প্রতি অধিক লোভ হলো এক অবাধ্যতা। আমি আবারো ঘোষণা করি,যে রাজকুমার পেতে পারতো স্বর্গ–লাভের তুষ্টি, তার পক্ষে রাজ্যলাভের শ্রম–সাধ্য উচ্চাকাংখা করা অবাধ্যতার চাইতে কম কিছু নয়। দোষ স্বীকার করা এবং খোদায় (ইস'আনা) বিশ্বাস করো, যিনি হচ্ছেন বাধ্যতা প্রাপ্তির হকদার। কারণ, আমি ঘোষণা করছি যে, স্বর্গের তুষ্টি লাভের জন্যে তুমি এর (এই বিশ্বাসের) সমকক্ষ কোন উপায় খুঁজে পাবে না। হে লোক সকল, এই অপরিমেয় সম্পদ লাভ করতে তোমরা কঠোর পরিশ্রম করো'।

এই লেখায় উল্লেখিত 'ইসআনা' হচ্ছে শিবদেবতার নাম (শিবরাম আপ্তে–প্রণীত সংস্কৃত–ইংরেজী অভিধান দেখুন)।

একই লেখক সপ্তম বস্ত্রখন্ডে উল্লেখ করেন:

"দেবনামপিয়া পিয়াদসি এমনটি বলেনঃ যেহেতু এ মুহুর্ত থেকে আমি ধর্মীয় প্রবন্ধাদি প্রচার করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেহেতু আমি এই ধর্মীয়–রীতি সমূহ নির্ধারণ করেছি যে, লোকেরা তা শুনে সঠিক পথের অনুসরণ করবে এবং খোদার প্রশংসা কীর্তন করবে"।

[লক্ষ্যনীয় যে, খোদা শব্দের জন্য (ইসআনা) এক বচনের ব্যবহার অত্যধিক তাৎপর্যপূর্ণ]।

(চলবে)

পাক্ষিক 'আহমদী' পত্রিকায় আপনিও লিখুন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আপনিও ধর্মীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ইসলামী দর্শন বিষয়ক নিবন্ধসহ তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক, লেখা-পড়া ও ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখে পাঠাতে হবে। ই-মেইলেও লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল : ০১৭১৬-২৫৩২১৬
ই-মেইল: pakkhik_ahmadi@yahoo.com, masumon83@yahoo.com

“বিভিন্ন ধর্মের আলোকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ও তাঁর সত্যতা”

মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন

(২য় কিস্তি)

আগমন স্থল ও নাম পরিচয়ের ধারাবাহিকতায়-

ঘ) হিন্দুধর্মের বক্তব্য

হিন্দু ধর্মেও শেষযুগে আগতকল্কি অবতারের আবাসস্থল সম্পর্কে একই কথা বলা হয়েছে-

শাম্ভলে বিষ্ণুযশস্যে গৃহে প্রাদুর্ভবামাহম

(কল্কি পুরাণ, ২য় অধ্যায়, শ্লোক-৪)

কলিরকালে বিষ্ণুদাশের গৃহে, সম্ভল গ্রামে কল্কি অবতারের জন্ম হবে।

বিষ্ণুদাস অর্থাৎ বিষ্ণুর দাস, স্রষ্টার দাস তার পিতার নাম হবে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যিনি কল্কি অবতার হওয়ার দাবী করেছেন তার পিতার নাম গোলাম মর্তুজা অর্থাৎ মর্তুজার দাস। স্রষ্টার দাস।

সম্ভালের একাধিক অর্থ রয়েছে। একটি অর্থ অর্থ হলো পুরোহিত বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গ্রাম। কাদিয়ান কাজী থেকে হয়েছে। অর্থাৎ কাজী সাহেবের গ্রাম। যে গ্রামে কাজী সাহেব অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি থাকেন।

সম্ভালের আরেকটি অর্থ হলো শান্তির গ্রাম, নিরাপদ স্থান।কাদিয়ানের আরেক নাম দারুল আমান শান্তির গ্রাম। এছাড়াআজ সেখান থেকেই সারাবিশ্বে শান্তির পয়গাম পৌঁছানো হচ্ছে। তরবারির যুদ্ধ রহিত হওয়া, খড়াব ভড়ৎ ধষষ যধঃৎবফ ভড়ৎ হড়হব. এই শ্লোগানগুলো প্রচারিত হচ্ছে।

সম্ভাল গ্রামের আরেকটি অর্থ ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, রিসার্স স্কলার সংস্কৃত বিভাগ , এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত, তাঁর পুস্তক “মুহাম্মদ সাহেব আওর কল্কি অবতার”- এ করেছেন- জলের নিকটবর্তী স্থান। কাদিয়ান পাঞ্জাবের একটি স্থান। পাঞ্জাব বলা হয় পঞ্চ নদীর সমাহারকে। এটি একটি নদী বিধৌত এলাকা। এছাড়া কাদিয়ানও বিপাশা নদীর উপকূলেই অবস্থিত।

হিন্দু শাস্ত্রে কল্কি অবতারের আরো যেসব পরিচয় দেয়া হয়েছে তার মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো-

বলা হয়েছে- তাঁর একজন গুরু থাকবেন। ততো বস্তুং গুরুকুলে যাত্রং-তিনি গুরুর নিকট যাবেন। (কল্কি পুরাণ, ৩য় তৃতীয়, শ্লোক-১)

তাঁর নিজের কোন ঐশী কিতাব থাকবে না। গুরুর কিতাব তিনি পাঠ করবেন, প্রচার করবেন। তুং পঠাত্র নিজং বেদং যচ্চান্যচ্ছাস্ত্র মুত্তমম (কল্কি পুরাণ, ৩য় অধ্যায়, শ্লোক-৮)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)এরও একজন গুরু রয়েছেন। আর তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)। তারঁ নিজের কোন ঐশী কিতাব নেই। তিনি তারঁ গুরুর কিতাব কুরআনই পাঠ করেন ও প্রচার করেন।

হিন্দু শাস্ত্রে আরো বলা হয়েছে– পুত্রানাহূয় চতুরো-তাঁর চার সন্তান থাকবে। (কল্কি পুরাণ, ৩য় অধ্যায়, শ্লোক-১১)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)এরও চার পুত্র সন্তানক জীবিত ছিলেন। তাঁরা হলেন হযরত মির্যা সুলতান আহমদ,হযরত মির্যা বশীরুদ্দিন মাহমুদ আহমদ, হযরত মির্যা বশীর আহমদ,হযরত মির্যা শরীফ আহমদ।

এ ছাড়াও আরো কিছু বিশেষ কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা কল্কি অবতার দ্বারা সাধিত হবে। তাহলো-

পুনঃ যে আসিয়া সত্যযুগ দেখা দিবে
অধর্ম ঘুচিইবে সত্য বাড়িয়া উঠিবে
মন্দ সংস্কার যত চিরবদ্ধমূল
প্রজা হতে হইবে নিমূর্ল
ধর্ম সহকারে যত নরপতিগন
করিবেন সুবিচারে পৃথিবী পালন (মহাভারত, বন পর্ব, অধ্যায়-১৯০)

কল্কি অবতার সংস্কার ও সুবিচার এই দুইটি কাজ করবেন। আর আমাদের প্রিয় নবী(স.) বলেছেন- প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীরও এ দুটি কাজ ক

রবেন- “তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ন্যায় বিচারক ইমাম মাহদীরূপে।” (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

অন্যত্র বলেছেন, মাই ইউযাদ্দিদু লাহা দিনাহা - তিনি ধর্মের সংস্কার করবেন

অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ, মাহদী, মৈত্রিয় ও কল্কি অবতারের বিষয়ে যতধরনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে সবই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)এর ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়েছে। এগুলো তাঁর সত্যতা সাব্যস্ত করছে।

এ কারণে আজ থেকে একশ‘ বছর পূর্বে আল্লাহ তা’লা হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ(আ.)-কে ইলহাম করে জানিয়ে ছিলেন- এ্যা কৃষণ রোদ্রর গোপাল তেরি মহিমা গীতা মে লিকয়ি গায়ী হে অর্থাৎ ‘হে কৃষ্ণ, রুদ্র গোপাল! তোমার মহিমা গীতায় লিখা আছে।’

এই ইলহাম হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সত্যতার এক অনন্য প্রমাণ। যখন এ ইলহাম হয়েছে তিনি জানতেনও না তাঁর কি মহিমা গীতায় আছে। কোথায় আছে? কিন্তু তিনি এটা লিখে গেছেন। জগৎকে জানিয়ে গেছেন। আমাকে আমার আলীমুল গায়ব খোদা এটা জানিয়েছেন। আমার মহিমা গীতায় লিখা আছে। আজ এ বিষয়টিও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আ.)এর সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে হযরত শ্রীকৃষ্ণ বলে

গেছেন-

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লার্নিভবতি ভারত
অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপর্নাথায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

(গীতা অধ্যায় ৪, শ্লোক ৭-৮)

অনুবাদ: যখনই ধর্মে অধ:পতন হবে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হবে, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হব।

সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হব।

কৃষ্ণ তাঁর শিষ্য অর্জুনকে ভবিষ্যতে আগত তাঁর কয়েকটিবিশ্বরূপ দেখালেন । যেখানে অর্জুন সহস্র সূর্যের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত এক মহাপুরুষকে দেখে বলে উঠলেন-

"দিবি সূর্য সহস্রস্য ভবেদযুগপদুত্থিতা

যদি ভা: সদৃশী সা স্যাদ ভাসস্তস্য মহাত্ম:" (গীতা অধ্যায় ১১, শ্লোক ১২)

অনুবাদ: যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয়, তাহলে সেই মহাত্ম বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিত তুল্য হতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন জাতীয় অবতার। কিন্তু অর্জুন তাঁর সামনে বিদ্যমান এই কৃষ্ণের চেয়ে হাজারো গুণ দীপ্তিমান এক সত্তাকে দেখলেন। যিনি হাজারো সূর্য তুল্য। যিনি শুধু এক জাতি, এক দেশের জন্য আসবেন না। আসবেন বিশ্বরূপ নিয়ে সমগ্র বিশ্বের জন্য। প্রশ্ন জাগতে পারে কে এই মহামানব? উত্তর হবে, নি:সন্দেহে তিনি ছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। যাঁকে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তুমি বল, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার জন্য আকাশসমূহের ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী আল্লাহর রসুল।" (সূরা আরাফ-১৫৯)

'সীরাজাম মুনিরা' আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র বলেও তাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (সূরা আহযাব-৪৭)

শ্রীকৃষ্ণ এই বিশ্ব অবতারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন- "পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান।" (গীতা অধ্যায় ১১, শ্লোক ৪৩)

তুমি এই বিশ্বচরাচরের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরুশ্রেষ্ঠ।

"মা কানা মুহাম্মাদান আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালা কির রাসুলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবেঈন" (সূরা আহযাব: ৩৩)।

ঠিক একইভাবে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এটাও স্পষ্ট করে বলেছেন, যেভাবে সূর্যরূপে তাঁর বিশ্বরূপের প্রকাশ হবে ঠিক সেভাবে চন্দ্ররূপেও তাঁর বিশ্বরূপের এক প্রকাশ ভবিষ্যতে হবে। বলছেন-

"নক্ষত্রানামহং শশী" -নক্ষত্রদের মাঝে আমি চন্দ্র হব। (গীতা, অধ্যায় ১০, শ্লোক ২১)

চন্দ্র হিসাবে তাঁর বিশ্বরূপ প্রকাশ পাবে। চাঁদের মত তিনি তখন অন্যের আলোয় আলোকিত হবেন। নিজের আলো থাকবে না।হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) চাঁদ হওয়ারই দাবি করেছেন। তিনি বলছেন-

"খোদার সাথে বাক্যালাপ ও ঐশী বাণী লাভের মর্যাদা, যার দ্বারা আমরা খোদাকে দেখতে পাই তাও আমরা এই মহামান্য নবীর মাধ্যমে লাভ করেছি। হেদায়তের আলোক রশ্মি যা সূর্যের আলোর ন্যায় আমাদের ওপরে পতিত হয় এবং যার মাধ্যমে আমরা আলোকিত হই তিনি হলেন আমাদের প্রিয় নবী। (হাকীকাতুল ওহী, পৃ-১১৫-১১৬)

সহস্র সূর্য ও চাঁদের আকারে ভবিষ্যতে যে অবতারের আগমন হবে তাঁরা শ্রী কৃষ্ণ নন। গীতায় বলা হয়েছে-

"সখেতি মত্ত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।" (গীতা, অধ্যায় ১১, শ্লোক-৪১)

তোমার মহিমা না জেনে সখা মনে করে তোমাকে আমি প্রবলভাবে (রীতি বিরুদ্ধ) হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা বলে সম্বোধনা করেছি। ভুলবশত অথবা প্রণয়বশত যা কিছু আমি করেছি তা তুমি দয়া করে ক্ষমা কর।

যদি সূর্য ও চন্দ্র আকারে আগমনকারী অবতারদ্বয় কৃষ্ণ না হন তাহলে তারা কারা? এটা একটা প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর হিন্দুশাস্ত্রেই দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে–

ইদংজনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে। ষষ্টিং সহস্রা নবতিংচ কৌরম আরুশমেষু দম্মহে। উষ্ট্রা যস্য প্রবাহানো বধুমাস্তো দ্বিদর্শ। (অর্থবেদ,সুক্তানী সূত্র,কান্ড-২০)

অনুবাদ হবে, ভবিষ্যতে নরাশংস নামে একজন অবতার আসবেন। তিনি ষাট হাজার নব্বই জন পলাতকের মাঝে সমহিমায় ও প্রতাপে উদ্ভাসিত হবেন। তিনি উটে আরোহী হবেন। তাঁর বার জন স্ত্রী থাকবে।

নরাশংস অর্থ নর দ্বারা প্রশংসিত অর্থাৎ সবাই যার প্রশংসা করে। এর আরবী প্রতিশব্দ মুহাম্মদ। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ক্ষেত্রেই ভবিষ্যদ্বাণীর বাকি অংশও অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। মক্কা বিজয়ের সময় মক্কার অধিবাসীর সংখ্যা ষাট হাজার ছিল। বিজয়ী প্রধান হিসেবে তখন মুহাম্মদ (সা.) স্বমহিমায় উদ্ভাসিত ছিলেন। ম াবাসীরা তখন পলাতক ছিল। তিনি উটের আরোহী ছিলেন। ভারতের অন্য কোন অবতার উটে আরোহী ছিলেন এটা প্রমাণিত নয়। মুহাম্মদ (সা.)-এরই বার জন স্ত্রী ছিলেন ভারতের কোন অবতারের ক্ষেত্রে এটাও সাব্যস্ত নয়।

আর চাঁদ হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। যে আহমদের প্রশংসায় গীতায় বলা হয়েছে-

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশ:

(গীতা অধ্যায় ১০, শ্লোক ২)

আহমদ দেবতা দেবতাদের মাঝে সর্বোতভাবে মহির্ষী

এই আহমদ দেবতার পরিচয় দিতে গিয়ে শ্যামবেদ, ঋগবেদ ও অথর্ববেদে বলা রয়েছে-

অহমিদ্ধি পিতুস্পরি মেধামৃতস্য জগ্রব। অহং সূর্য ইবাজনি। (শ্যামবেদ, পূর্বাচিক, ঐন্দ্রকান্ড, চতুর্থ খন্ড, মন্ত্র-১৫২, মন্ত্র-১৫০০; ঋগবেদ ৮ম মন্ডল, ৭ সুক্ত, শ্লোক-১০; অথর্ববেদ : কান্ড ২০, ঊনবিংশ যুক্ত)

আহমদ তার পিতা থেকে ঐশী জ্যোতি লাভ করেছে। আমি সূর্য থেকে উদ্ভুত।

বলা হয়েছে- আহমদ তাঁর পিতা থেকে ঐশী জ্যোতি লাভ করবেন। আর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তিনি নিজে বলছেন-

"আমি আমার নবী করীম (সা.)-এর মাধ্যমেই স্বর্গীয় আশিস ও বরকত লাভ করেছি।"

(মককুবাতে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড)

সত্যতার কিছু প্রমাণ
মিথ্যাবাদী ধ্বংস

এটা আল্লাহ তা'লার এক চিরস্থায়ী, অমোঘ বিধান। সত্যবাদীকে তিনি কখনও ধ্বংস করেন না। তবে মিথ্যাবাদীকে তিনি অবশ্যই ধ্বংস করেন। তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। এ বিষয়টি প্রত্যেক ধর্মেও স্বীকৃত । পবিত্র কুরআন বলছে, "আর সে যদি কোন মামুলি কথাকেও মিথ্যা বানিয়ে আমাদের প্রতি আরোপ করতো, তাহলে নিশ্চই আমরা তাকে ডান হাতে ধরতাম, এবং আমরা অবশ্যই তার জীবন শিরা কেটে

দিতাম"। (সূরা আল হাক্কা : ৪৫-৪৭)

মিথ্যা নবী, নবুওয়তের দাবীদার হলে আল্লাহ নিজেই তাকে ধ্বংস করে দেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে কাইয়ুম বলেন, "আমরা এই বিষয়টাকে অস্বীকার করছি না, এমন অনেক মিথ্যা নবী দাবিকারক নবুওতের দাবি করেছেন এবং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিও প্রকাশিত হয়েছে। তবে তাদের উদ্দেশ্য কখনো সফল হয়নি আর তাদের দীর্ঘ সময় বেচে থাকার সুযোগও দেয়া হয়নি। বরং খোদা তালা তাঁর ফেরেশতাদেরকে তাদের ধ্বংস করার জন্য প্রেরন করেছেন, যারা তাদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের গোড়ালিসহ উপড়ে ফেলে দিয়েছেন । এই খোদা তা'লার সুন্নত যা দুনিয়া সৃষ্টি থেকে আজ অবদি তার বান্দাদের মাঝে চলে আসছে । (যাদুল মাআদ, ১ম খণ্ড,পৃ: ৫০০)

কুরআনের অনুরূপ বক্তব্য বাইবেলেরও। বাইবেলে বলা হয়েছে-

"কিন্তু আমি আদেশ দেইনি এমন কোন কথা যদি কোন নবী আমার নাম করে বলতে সাহস করে কিংবা সে যদি দেব-দেবতার নামে কথা বলে, তবে তাকে মেরে ফেলা হবে।"

(দ্বি বি-১৮:২০/যেরমিয়-১৪:১৪-১৬/ দ্বি বি-১৩:৫/ হিযকিল-১৩:৭-১৩)

"যে চারা আমার স্বর্গস্থ পিতা লাগাননি তার প্রত্যেকটাকে উপড়ে ফেলা হবে।" (মথি ১৫:১৩)

এ বিষয়ে হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে-

"ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি" -আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হন না। (গীতা, অধ্যায়-৯, শ্লোক-৩১)

"তুমি আর্যরূপে স্বীয় ভক্তকে রক্ষা কর আর অস্ত্র দ্বারা দস্যুকে বিনাশ কর।" (ঋগবেদ, ৫ম খণ্ড, ৪ সুক্ত, শ্লোক-৬)

হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত উৎকৃষ্ট ধরনের কর্তা এ কথা সত্য । তোমার অভিষ্ট বিষয়ে কেউ তোমাকে বারন করতে পারে না। (ঋগবেদ, ৭ম খণ্ড, ৩২ সুক্ত, শ্লোক-১৬)

অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম একমত মিথ্যা নবী ধ্বংস হয়। তাকে মিটিয়ে ফেলা হয়। আর পৃথিবীর ইতিহাসও এর সাক্ষি। হাজার হাজার মিথ্যা নবী, মিথ্যা মাহদী, মিথ্যা মসীহ, মিথ্যা অবতারের আগমন হয়েছে। কিন্তু সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। কারো নাম নিশানা নেই। নাম নেয়ার লোক নেই। একজনও দেখাতে পারবেন না। পক্ষান্তরে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) প্রতিশ্রুত মাহদী, প্রতিশ্রুত মসীহ, প্রতিশ্রুত কল্কি অবতার হওয়ার দাবী করেছেন। ঘোষণা দিচ্ছেন- "আমি ঐ খোদার কসম খেয়ে বলছি- যার হাতে আমার প্রাণ। আমি ঐ প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী যার সংবাদ মহানবী (সা.) হাদীস শরীফে দিয়ে গেছেন। যা বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সিহাহ্ সিত্তায় রয়েছে। আর এ ব্যাপারে সাক্ষি হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ-৩১৩)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবুওয়তের দাবির পর ২৩ বছর জীবিত ছিলেন ।হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সর্ব প্রথম ১৮৭৬ সালে ইলহাম লাভ করেন। আর জীবিত ছিলেন ১৯০৮ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ ৩২ বছর জীবিত ছিলেন। ১৮৮২ সালে মামুর হওয়ার দাবি করেন। তশ্রুত মাহদী, প্রতিশ্রুত মসীহ, প্রতিশ্রুত কল্কি অবতার হওয়ার দাবী এর পরও তিনি ধ্বংস হননি। তাঁর জামা'ত ১১৬ বছরে ফুলে-ফলে সুশোভিত। ২০৬টি দেশে তাঁর জামাত প্রতিষ্ঠিত। কোটি কোটি তাঁর মান্যকারী। এটা তাঁর সত্যতার জ্বাজল্যমান প্রমাণ নয় কি?

পক্ষান্তরে দেখেন বিগত চৌদ্দশ' বছর পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় শত শত লোক মাহদী ও নবী হওয়ার দাবি করেছে। তাদের একজনকেও খুজে পাবেন না যার জামা'ত আছে। তার নাম নেয়ার লোক পৃথিবীতে আছে। বরং প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ তা'লা নিজেই তাদের সমূলে উৎপাটিত করেছেন। তাদের নাম নিশানা মিটিয়ে দিয়েছেন। তাদের অনেকের দাবির সময় হাজার হাজার , লক্ষ লক্ষ মান্যকারী ছিল। কিন্তু আজ কেউ নেই।

চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ

আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন-"ওয়াকাসাফাল কামারু ওয়া জুমিয়াসশামসু ওয়াল কামারু ইয়াকুলুল ইনসানু ইয়াওমাইজিন আইনালমাফার" (কিয়ামা-১০-১১) অর্থাৎ- চন্দ্র গ্রহণ হবে, সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে অর্থাৎ সূর্য গ্রহণ হবে। সেই সময় লোকেরা বলবে আর পলায়ন করার জায়গা কৈ? অর্থাৎ দলিল প্রমাণ দ্বারা অস্বীকার করার আর কোন পথ থাকবে না।

মহানবী (সা.) ইমাম মাহদীর সত্যতার সপক্ষে একটি অনন্য ও অভূতপূর্ব নিদর্শনের কথা বলেছেন। এটা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে কারো সত্যতার জন্য প্রদর্শিত হয়নি। তিনি বলেছেন- নিশ্চয়ই আমাদের মাহদীর সত্যতার এমন দু'টি লক্ষণ আছে, যা আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত অন্য কারও সত্যতার নির্দশন স্বরূপ প্রর্দশিত হয়নি। তাহলো- একই রমযান মাসের (চন্দ্র গ্রহণের) প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং সূর্য গ্রহণের মধ্যম তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে। (দারে কুতনী শরীফ-১৮৮)

হিন্দু শাস্ত্রেও শেষযুগে এমন একটি গ্রহণের বিষয়ে বলা হয়েছে-সূর্যং রাহুরুপষ্যতি- সূর্য রাহুগ্রস্থ হবে (মহাভারত, বনপর্ব-১৯০/৮৮)

তখন সূর্য, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি এক রাশিতে পক্ষ নক্ষত্রে একত্রিত হবে।(ভগবত পুরান,১৩ স্কন্দ)

খ্রিষ্টধর্মে বলা হয়েছে- সেই সময়কার কষ্টের ঠিক পরেই সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ আর আলো দেবে না । (মথি ২৪:২৯-৩১),(লুক ২১:২৪-২৮)

তখন আকাশের তারা ও নক্ষত্রপুঞ্জ আলো দেবে না, সূর্য উঠবার সময়েও অন্ধকার থাকবে আর চাঁদও আলো

তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ন্যায় বিচারক ইমাম মাহদীরূপে।

প্রত্যেক ধর্ম একমত মিথ্যা নবী ধ্বংস হয়। তাকে মিটিয়ে ফেলা হয়। আর পৃথিবীর ইতিহাসও এর সাক্ষি। হাজার হাজার মিথ্যা নবী, মিথ্যা মাহদী, মিথ্যা মসীহ, মিথ্যা অবতারের আগমন হয়েছে। কিন্তু সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। কারো নাম নিশানা নেই।

দেবে না।.....(যিশাইয় ১৩:১০)

শিখ গ্রন্থেঃ শিখদের গ্রন্থেও আছে যে, যখন মাহদী মীর আবির্ভুত হবেন তখন চন্দ্র ও সূর্যেও তাঁর লক্ষণ প্রকাশিত হবে। যথা- "নিহ কলঙ্ক বাজে ডঙ্ক, চড়হোদিল রবি ইন্দ্রজিও ।"(গ্রন্থ সাহেব মুহল্লা ৭, ঝুলনা ৪)।

এসট্রোনোমিক্যাল বা জ্যোর্তিবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম অনুসারে চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হয়। আর সূর্যগ্রহণ যথাক্রমে ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখে হয়। অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ চান্দ্র মাসের ১৩ তারিখে হলে সূর্যগ্রহণ ২৭ তারিখে হবে। চন্দ্রগ্রহণ ১৪ তারিখে হলে সূর্যগ্রহণ ২৮ তারিখে হবে। চন্দ্রগ্রহণ ১৫ তারিখে হলে সূর্যগ্রহণ ২৯ তারিখে হবে।

কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী (স.) বলেছেন, আমার মাহদীর দাবির পর তার সত্যতার জন্য, নিদর্শনরূপে যে গ্রহণ হবে- এটা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে হবে না। এটা হবে ব্যতিক্রমধর্মী।

অর্থাৎ প্রথমত: একই রমযানে এ গ্রহণদ্বয় হবে।

দ্বিতীয়ত: চন্দ্রগ্রহণের প্রথম তারিখে অর্থাৎ ১৩ রমযানে চন্দ্রগ্রহণ হবে। আর সূর্যগ্রহণ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ২৭ তারিখে না হয়ে এটা ২৮ তারিখে হবে।

তৃতীয়ত: আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর ইমাম মাহদী ছাড়া আর কারো সত্যতার প্রমাণ হিসাবে এমন ব্যতিক্রমধর্মী নির্দশন প্রদর্শিত হয়নি।

একারণে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যখন ১৮৯১ সালে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবী করেন। তখন মৌলবী মৌলনারাচিৎকারকরতে শুরু করে একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ ছাড়া আপনাকে গ্রহণকরব না । তখন আলেম উলামারা হৈ-হোল্লোর শুরু করলেন- আপত্তি তুললেন- আপনি মাহদী হলে ঐ প্রতিশ্রুত চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ কোথায়?

তখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আল্লাহ তা'লার দরবারে বিনত হয়ে দোয়া করতে লাগলেন, "হে আল্লাহ! এ গ্রহণ দেখাও, এ নির্দশন প্রকাশ কর।তখন তিনি দোয়া করলেন, "ফাফতা বাইনানা ওয়া বাইনা কাউমিনা বিলহাক্কে ওয়া আনতা খায়রুল ফাতেহীন" অর্থা আমার ও আমার জাতির মধ্যে সত্য সহকারেফয়সালা কর, কেননা একমাত্র তুমিই উৎকৃষ্ট ফয়সালাকারী (নুরুল হক, ১ম খণ্ড)।

অবশেষে আল্লাহ তা'লা তাঁর দোয়া শুনলেন- তাঁকে জানিয়ে দিলেন এ নির্দশন প্রকাশিত হবে। তুমি ঘোষণা দাও। তিনি জগদ্বাসীকে জানিয়ে দিলেন।এরপর ১৮৯৪ সালের অর্থাৎ ১৩১১ হিজরীর রমযান মাসের ১৩ তারিখ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯-৩০ মিনিট পর্যন্ত চন্দ্রগ্রহণএবং ২৮ তারিখ সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সূর্যগ্রহণহয়। চাঁদের ১৩ এবং ২৮ তারিখ ছিল ২১ মার্চ ও ৬ এপ্রিল। এই গ্রহণের সংবাদ আজাদ পত্রিকা এবং সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট পত্রিকায় ছাপা হয়। (চৎড়ভ. ঞ. জ ঠড়হ তার ঈধহড়হ ড়ভ ঊপষরঢ়ংবং গ্রন্থ ১২৮০ থেকে ২১৬১ অ.উ পর্যন্ত গ্রহণগুলির তারিখ মুদ্রিত করেছেন। এই গ্রন্থেও উল্লেখিত তারিখদ্বয়ে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের উল্লেখ আছে। ১৮৯৪ সালের ঘধঁঃরপধষ অষসধহধপ, খড়হফড়হ-ও এই গ্রহণের উল্লেখ আছে। এ ছাড়া শরশিনার পীর সাহেবের ১৯১৬ সালে প্রকাশিত মদিনা কল্কি অবতারের সফিনা পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠায়ও এ গ্রহণদ্বয়ের উল্লেখ রয়েছে।

এই গ্রহণের পর মৌলবী সাহেবরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাদের চেহারা মলিন হয়ে গেল। তাদের ঘরে ঘরে মাতম শুরু হল। কিন্তু এরপরও তারা জাজ্বল্যমান সত্যকে মানতে রাজী নন। নতুন মাসালা তৈরী করা হল। বলা হল, 'চন্দ্রগ্রহণ হবে রমযানের প্রথম তারিখে। কিন্তু এই গ্রহণহয়েছে রমযানের ১৩ তারিখে। অতএব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি। আমরা মির্যা সাহেবকে মানিনা, মানব না'। মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উত্তরে বলেন যে, প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণহওয়ার অর্থ প্রাকৃতিক নিয়মে চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্ধারিত রাতগুলির প্রথম রাত অর্থাৎ ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণহওয়া (নুরুল হক, ২য় খন্ড)।

এখানে উল্লেখ্য যে, হাদীসে চন্দ্রের জন্য 'কমর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম থেকে তৃতীয় দিনের চাঁদকে আরবীতে হেলাল বলে। চার থেকে মাসের শেষ দিন পর্যন্ত চাঁদকে আরবীতে কমর বলে (আকরাবুল মুয়ারেদ, ২য় খণ্ড)।

অতএব হাদীসে যেহেতু কমর শব্দ এসেছে সেহেতু এই গ্রহণকখনও প্রথম দিনের অর্থাৎ দ্বিতীয়ার চাঁদে হতে পারে না। প্রথম দিনের চাঁদ তো দেখাই যায় না অনেক সময়। ঈদ ও রমযানের চাঁদ দেখা নিয়ে কতই না মতভেদ দেখা যায় আলেম ওলামাদের মাঝে। এজন্য সরকার গঠন করেছেন রুয়েতে হেলাল কমিটি। সরু-বক্র-ক্ষীণ চাঁদে কি গ্রহণদর্শন সম্ভব? কখনোই না। সত্য মাহদীকে না মানার জন্য ওলামারা এই হঠকারীতা করে যাচ্ছেন।

(চলবে)

জয়তু খেলাফত

সিবগাতুর রহমান

দিশাহীন যবে মুসলিম জাতি
নাই কোন কান্ডারি
ছিড়ে যায় পাল কে ধরিবে হাল
মু'মিনের আহাজারি।
তখনি খোদার আশিষ লইয়া
আবার এল খেলাফত,
এসো ভাইসব মোমেনের দল
ছেড়ে যত ঝুটা পথ।
হাঁটি হাঁটি করে খেলাফত আজি
পৃথিবীর কোণে কোণে,
নিত্য ঈমান করি মোরা তাজা
খলিফার বাণী শুনে।
পৃথিবীতে মোরা আল্লাহ্‌র আদেশে
মসজিদ করি নির্মাণ,
সাদা কালো সব ভেদাভেদ ভুলে
গাহি সাম্যের জয়গান।
'আহমদী' মোরা এক জাতি আজ
এক আলোকিত মতবাদ,
সারা পৃথিবীতে একই ধ্বণি বাজে
খলিফা জিন্দাবাদ।
খেলাফতে এক পতাকার তলে
আমরা দীপ্যমান,
খলিফার আদেশে সদা নতশীর
যায় যাবে যাক প্রাণ।
সদা অপরূপ ইসলামে আজি
সুশোভিত খেলাফত,
সব মু'মিনীন সমস্বরে বল
জয়তু খেলাফত।

রোযা
দৈহিক ও আধ্যাত্মিক রোগমুক্তির কারণ

মাহমুদ আহমদ সুমন

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় আমরা পবিত্র মাহে রমযানে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। হয়তো লেখাটি পাঠকের হাতে পৌঁছতে রমযান শুরু হয়ে যাবে। পবিত্র এ মাসের রোযার মধ্যে এতই বরকত ও কল্যাণ রয়েছে যে, ভাষায় প্রকাশ করার মত নয় আর এর পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নিজে দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের জন্য সেভাবে রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।" (সূরা বাকারা : ১৮৪)

পবিত্র মাহে রমযানের রোযা কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক কল্যাণই লাভ হয় না বরং এতে দৈহিক শক্তিরও বিকাশ ঘটে। তাইতো রোযা-পালন সম্পর্কে যেমন রয়েছে মহান আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ, অন্যদিকে রয়েছে অসংখ্য পার্থিব-কল্যাণ। যেভাবে হাদীসে উল্লেখ আছে 'তোমরা রোযা রাখ, তাহলে সুস্থ্য থাকতে পারবে।' এছাড়াও রোযা যে মানব জাতির রোগমুক্তির কারণ, তা বহু হাদীসে প্রমাণিত আর আজ চিকিৎসাবিজ্ঞানও রোযার অপরিহার্যতা স্বীকার করে।

আমরা জানি, মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার দৈহিক গঠন-প্রকৃতি ও স্থিতিশীলতায় অবদান রাখে সত্য, কিন্তু এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর কাজের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন সীমাবদ্ধতা আছে মানুষের দৈহিক কাজকর্মে। উদাহরণস্বরূপ, কোন মানুষ যখন অনেক সময় পর্যন্ত কাজ করতে থাকে, তখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম নিতে পারে, তাহলে আবার কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সতেজতা ফিরে পায়। ঠিক তেমনিভাবে মানুষের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; যেমন: জিহ্বা, লালাগ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড, কিডনি, পাকস্থলী, কোষ, লিভার, মূত্রথলি, প্রভৃতিরও কাজের একটা নির্দিষ্ট প্রকৃতি, পরিমাণ ও সীমাবদ্ধতা আছে। অর্থাৎ মানুষ যখন সকাল-বিকালের নাস্তাসহ দুপুর ও রাতে খাবার খায়, তখন স্বভাবতই সর্বাবস্থায় তার উদর পূর্ণ থাকে বা উদরে খাদ্যকণা অবস্থান করে থাকে। আর এই খাদ্যকণাগুলোকে হজম করার জন্য মানবদেহের অভ্যন্তরীণ সামান্য লালাগ্রন্থি থেকে শুরু করে পাকস্থলী পর্যন্ত অনবরত কাজ করে থাকে। এমনকি পেটে যদি একটি সরিষা পরিমাণ খাদ্যকণাও অবশিষ্ট থাকে, তাহলেও এই সামান্য খাদ্যকণাকে হজম করার জন্য অভ্যন্তরীণ সবকিছুই একসঙ্গে কাজে লেগে যায়। ফলে এগুলো কখনও ন্যূনতম বিশ্রামের সুযোগও পায় না এবং ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে বদহজম থেকে শুরু করে উচ্চ-রক্তচাপ,

বহুমূত্র, পিত্তথলিতে পাথর, বাত, হাঁপানি, পেপটিক আলসার, করোনারি হৃদরোগ ও মাইগ্রেইনসহ অনেক জটিল রোগ হতে পারে।

কিন্তু এক্ষেত্রে রোযা এমন একটি মাধ্যম, যা মানবদেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষাসহ সব ধরনের রোগ প্রতিরোধে সক্ষম। কারণ পূর্ণ এক মাস রোযা রাখার পর ওইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈনিক প্রায় ৫-৬ ঘণ্টা বিশ্রামের সুযোগ পায়। ফলে পরবর্তীতে এগুলো আরও শক্তি নিয়ে মানবদেহে কাজ করতে পারে। এমনকি অনবরত খাদ্যগ্রহণে মানবদেহের পেটে এক ধরনের বিষাক্ত বর্জ্য-পদার্থের সৃষ্টি হয়, যা পানাহার বা রোজা ব্যতীত পরিহার সম্ভব নয়।

রোযার পার্থিব উপকারিতায় বিগলিত হয়েই ইহুদি-খ্রিস্টানসহ বিশ্বের অনেক অমুসলিম গবেষক, বিজ্ঞানী ও ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শারীরিক-ফিটনেস ও সুস্থ-সবল দেহ ও মনের জন্য মুসলিম পন্থায় রীতিমতো রোযা রাখছেন।

হল্যান্ডের পোপ এলফ গাল ছিলেন একজন বড় পাদ্রী ও চিকিৎসক। তিনি তার দুরারোগ্য রোগীদের সুস্থতার জন্য বছরে পূর্ণ এক মাস রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন, 'আমি ডায়াবেটিস (Diabetes), হৃদরোগ (Hart Diseases) ও পাকস্থলী রোগে (Stomachie Diseases) আক্রান্ত রোগীদের পূর্ণ একমাস রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকি। মূলত তার এই পদ্ধতিতে রোগীরা খুবই উপকৃত হয়েছে। বিশেষত সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতো পাকস্থলীর রোগীরা।

এছাড়াও ডা. লুথরজেম অব ক্যামব্রিজ (Dr. Luthorjem of Cambridge), সিগমন্ড নারায়াড (Sigmond Narayad), প্যারাসাইকোলজি রিচার্স (Research of parapsychology), অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিসহ (Oxford University) বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও গবেষণা-কেন্দ্র অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে রোযার ওপর গবেষণা করে দেখেছেন, রোযা মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা, মানসিক-শান্তি ও প্রবৃদ্ধির অপরিহার্য নিয়ামক। আজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ-দাবি খুবই যুক্তিযুক্ত, মানবদেহের যকৃতের অবসর গ্রহণের সময়কাল বছরে কমপক্ষে এক মাস হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর যেহেতু উপবাস ব্যতীত যকৃতের অবসর সম্ভব নয়, তাই পুরো এক মাস রোযাই এর সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। রক্তের বিশুদ্ধতা অর্জনে ও রক্তনালীতে চর্বি জমানো থেকে বিরত রাখতে রোযার ভূমিকা অপরিহার্য। রোযার ও অজুর যৌথ প্রতিক্রিয়ায় যে শক্তিশালী সমন্বয় সাধিত হয়, তার মাধ্যমে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহের এক অতুলনীয় ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, যা সুস্থ্য থাকার পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও রোযা দেহের অণুকোষ ও প্রজনন অঙ্গগুলোয় নব জীবনীশক্তি প্রবাহিত করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন– 'তোমরা যদি অনুধাবন কর, তাহলে তোমাদের জন্য এটা উত্তম যে, তোমরা রোযা রাখবে।' (সূরা বাকারা : ১৮৫)

ডা. এলেক্স হিগ বলেন, 'রোযা থেকে মানুষের মানসিক শক্তি এবং বিশেষ বিশেষ অনুভূতিগুলো উপকৃত হয়। যেমন- স্মরণশক্তি বাড়ে, মন:সংযোগ ও যুক্তিশক্তি পরিবর্ধিত হয়, প্রীতি-ভালবাসা, সহানুভূতি, অতিন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্মিক-শক্তির বিকাশ ঘটে, ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি, প্রভৃতি বেড়ে যায়। আর রোযা শরীরের রক্তের প্রধান পরিশোধক। অ্যালোপ্যাথিক শাস্ত্রে রোগ নিরাময়ের যতগুলো প্রতিকার এবং প্রতিষেধক রয়েছে, রোজা তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ। মূলত এজন্যই রমযান মাসে হাসপাতাল, ক্লিনিক ও প্রাইভেট প্র্যাকটিসে রোগীর উপস্থিতি তুলনামূলক অনেক কম হয়। এতে কি প্রতীয়মান হয় না, বরকতময় রমযান মাসে রোগব্যাধি কম প্রকাশ পায়। তাই বিষয়টি স্পষ্ট যে, রোযা রাখার ফলে আমরা যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে পারি অপর দিকে দৈহিকভাবেও আমরা সুস্থ্য থাকতে পারব।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রমযান মাসের প্রথম রাত্রিতে শয়তান এবং দুষ্কৃতকারীদের শিকলাবদ্ধ করা হয় আর জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয় আর একটি দরজাও খোলা থাকে না কেবল জান্নাতের দরজা খোলা হয়ে থাকে আর তার একটি দরজাও বন্ধ থাকে না। আর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন যে, পূণ্যকর্মকারীরা আস আর অগ্রসর হতে থাক আর মন্দের প্রসারকারীরা থেমে যাও আল্লাহ তা'লার কারণে অনেককে আগুন থেকে মুক্তি দেয়া হয়। রমযানের প্রত্যেক রাতেই এমনটি হয়ে থাকে। (তিরমিযি)

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ইসলামের এই মৌলিক রুকনের কতই না গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও আন্তরিকতা এবং উত্তম ফল লাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হয়"। (বুখারী)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে রমযানের দিনগুলোতে বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগিতে রত থেকে কাটানোর তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

রোযা এমন একটি মাধ্যম, যা মানবদেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষাসহ সব ধরনের রোগ প্রতিরোধে সক্ষম। কারণ পূর্ণ এক মাস রোযা রাখার পর ওইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈনিক প্রায় ৫-৬ ঘণ্টা বিশ্রামের সুযোগ পায়।

রোযা রাখার ফলে আমরা যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে পারি অপর দিকে দৈহিকভাবেও আমরা সুস্থ্য থাকতে পারি।

শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস
সালানা জলসার ইতিবৃত্ত

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(প্রথম কিস্তি)

বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আখেরী যামানায় হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের পরিপূর্ণতার শিক্ষা বিশ্বব্যাপী বাস্তবরূপ দানের উদ্দেশ্যে তিনি আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক মনোনীত হন। ফলে বিশ্বব্যাপী ইসলামের শান্তির বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ২৩ মার্চ ১৮৮৯ তারিখ থেকে তিনি বয়আত নেয়া শুরু করেন। তাই আল্লাহ্ তা'লার হেদায়াত প্রাপ্ত অনেক পুণ্যবান ব্যক্তির তাঁর অনুগমনের সৌভাগ্য হয় এবং এর প্রবাহমান ধারা অব্যাহত রয়েছে। অবক্ষয় মুক্ত বিশ্ব গড়ার শান্তির বাণী প্রচার ও প্রসারের গতিধারা সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণের পর নিজ নিজ স্থানে চলে যায় তাঁদেরকে হুযূর (আ.)-এর সাথে তথা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগের সেতুবন্ধন গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়। জামাতী তালিম-তরবিয়তে ঈমান ও আমলের দৃঢ়তায় উত্তম মু'মিন-মুত্তাকী হওয়ার আবশ্যক হয়। সকল বিরোধিতা মোকাবেলা করার সংকল্প এবং তবলীগের রণকৌশল প্রয়োগের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব দেখা হয়। এক মু'মিন আর এক মু'মিনের আয়না স্বরূপ পরিস্ফুটিত হওয়ার পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টির দরকার হয়। তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে একটি সমাবেশ আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

উপরন্তু, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯১ সালে 'আসমানী ফয়সালা' নামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এতে যে সকল আলেম তাঁকে কাফের ফতোয়া দেয় তাদেরকে তিনি আহ্বান করেন। পবিত্র কুরআন মজীদে মু'মিনদের যে চিহ্নাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এর ভিত্তিতে তাঁর সাথে প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান জানান। এ প্রতিযোগিতায় সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের লক্ষ্যে লাহোরে একটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব দেন। এ আঞ্জুমানের সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে। তিনি (আ.) এ আঞ্জুমানের অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে আরও পরামর্শের জন্য জামা'তের লোকদের সাথে আলোচনা প্রয়োজন মনে করেন।

সে সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর ইলহাম হয়–"ওয়াচ্ছে মাকানাকা ইয়াতুনা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমিক অর্থাৎ তোমার গৃহকে প্রশস্ত কর। তোমার কাছে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসবে (তাজকিরা)।

তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ২৭ ডিসেম্বর ১৮৯১ তারিখ এক জলসার উদ্দেশ্যে জামা'তের লোকদেরকে কাদিয়ান আসার আহ্বান জানান। এতে ৭৫ জন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি উপস্থিত হন। সে দিন যুহরের নামাযের পর মসজিদে আক্সায় জলসা আরম্ভ হয়। হযরত মৌলবি আব্দুল করিম সিয়ালকোটী (রা.) 'আসমানী ফয়সালা' পুস্তকটি পাঠ করেন এবং এটি প্রকাশের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়। জামা'তের বন্ধুগণ হুযূর (আ.)-এর সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করে ধন্য হন।

পরবর্তীতে এ জলসা সালানা জলসার রূপ গ্রহণ করে। প্রতি বছর জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয়। হুযূর (আ.) জলসা উপলক্ষে বিভিন্ন সময় এর উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ওপর নসিহতমূলক অনেক অমূল্য বক্তব্য এবং ইশতেহার প্রকাশ করেছেন। সাধারণত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিন দিনের জন্য জলসা অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসা উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে বলেন– "এ জলসা এমন তো নয় যে, জাগতিক মেলার মত অযথা এর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিতেই হবে। বরং এ জলসা অত্যন্ত পবিত্র নিয়্যত ও মূল্যবান ফলাফল বহনকারী হতে হবে। এ জলসা কোন জাগতিক রং তামাশার জন্য নয়" (মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪০-৪৪৩)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ

"[ইমাম হযরত (আ.)-এর] বয়আতের ধারাবাহিক বন্ধনের মাঝে প্রবেশ করার পর বয়আতকারী ব্যক্তির তাঁর সাথে বার বার মুলাকাৎ করা (সাক্ষাৎ) উচিত, কোন বয়আতকারী যদি বার বার ইমামের সাথে মুলাকাতের আগ্রহ না রাখে তাহলে তাঁর বয়আত বরকত বিবর্জিত, সারশূন্য ও কেবল রীতিমাত্র। সর্বসাধারণের জন্য, প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে, অথবা শক্তি-সামর্থ্য না থাকার কারণে, অথবা সফরের দুরত্বের কারণে এখানে এসে যথেষ্ট সময় ইমামের সাথে থাকার অথবা বছরে

একাধিকবার কষ্ট করে এখানে এসে ইমামের সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ হয় না। অধিকাংশ মানুষের অন্তরে এত বেশি আগ্রহ বা উৎসাহও থাকে না যে, তারা মুলাকাতের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে অনেক বড় ক্ষয়-ক্ষতি নিজের ওপর আরোপ করে এখানে আসবে। এসব কারণে বছরে একবার তিন দিনের জন্য এখানে এমন জলসা অনুষ্ঠান করা সমীচীন মনে হয়েছে যাতে জামা'তের সকল আহমদী যারা আন্তরিকতা রাখে, যদি আল্লাহ্ চাহেন, স্বাস্থ্য ও সুযোগ-সুবিধা যাদের আছে তারা সময়মত নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে উপস্থিত হবেন" [মজমুয়া ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০২]।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন ঃ "যতদূর সম্ভব, সাধ্যমত চেষ্টা করে, বন্ধুদের কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে, তরবিয়তী কথাবার্তা শোনার উদ্দেশ্যে এবং দোয়ায় শামিল হবার জন্য নির্ধারিত তারিখে এখানে চলে আসা উচিত। এ জলসায় এমনসব মূল্যবান হকীকত ও মা'রেফাতের কথা শোনানো হবে যা ঈমান, ইয়াকীন এবং মা'রেফাতকে বাড়ানোর জন্য আবশ্যক। এছাড়া এসব বন্ধুর জন্য দোয়াও করা হবে। বিশেষ মনোযোগ সহকারে দোয়া করা হবে। আরহামুর রাহেমীন (সবচেয়ে বড় দয়ালু)-এর দরবারে চেষ্টা করা হবে আল্লাহ্ যেন এদেরকে নিজের কাছে টেনে নেন এবং এদেরকে নিজ বান্দা হিসেবে কবুল করেন এবং এদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন। একটি সাময়িক উপকার এটাও তাঁরা লাভ করবেন যে, প্রতি বছর যেসব নতুন নতুন ভাই জামাতে শামিল হয়েছেন নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে তাদের সাথে দেখা করবেন। তাদের মুখ দেখে নিবেন, পরিচিত হবেন এবং পরস্পরের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উন্নতি হয়ে ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।.....এ আধ্যাত্মিক জলসায় আরো অনেক রূহানী উপকার লাভ হবে যা ইনশাআল্লাহুল কাদীর সময়ে সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে" [ইশতেহার, ৩০ ডিসেম্বর, ১৮৯১ রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৫২]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেন ঃ

"এ জলসায় নিশ্চয় আরো কিছু বরকতময় উদ্দেশ্য থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে যাতায়াত খরচ ইত্যাদি বহন করার সামর্থ্য রাখে সে যেন অবশ্যই এ জলসায় আসে এবং শীতের বিছানা, লেপ বা কম্বল ইত্যাদি যা যা প্রয়োজনীয় তা যেন সঙ্গে নিয়ে আসে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের রাস্তায় ছোট ছোট বাধা-বিপত্তিকে যেন গুরুত্ব না দেয়" [ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর ১৮৯২ মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪১]

হুযূর (আ.) বলেছেন ঃ

".....যাদের (আর্থিক) সংগতি স্বল্প তাঁদের জন্য সমীচীন হবে তাঁরা যেন অনেক আগ থেকেই জলসায় উপস্থিত হবার জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও মিতব্যয়িতা বা কম খরচ করে করে সামান্য সামান্য টাকা যেন প্রতিদিন বা প্রতিমাসে জমাতে থাকে। পৃথক করে রাখতে থাকে যেন যথাসময়ে টাকার সমস্যা না হয় এবং এ সফর যেন বিনা খরচেই সফল হয়ে যায়" [মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, (লন্ডনে প্রকাশ) পৃঃ ৩০২-৩০৩]

হযরত (আ.) আরো বলেছেন ঃ "মানুষ এখনও আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত নয় যে, আমরা কি চাই যেন তারা সেরকম হয়ে যায়। আমরা যা চাই, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ আমাদেরকে আবির্ভূত করেছেন, তা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয় যদি মানুষ বার বার এখানে (ইমাম-আ.)-এর সান্নিধ্যে না আসে এবং এখানে আসতে যেন বিরক্তিবোধ না করে।"

আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মনে করে যে, এখানে আসতে গেলে তাঁর ওপর বোঝা হয়ে যায়; অথবা সে যদি মনে করে যে, এখানে এসে অবস্থান করলে আমাদের ওপর বোঝা হবে- তাঁর ভয় পাওয়া উচিত যে, সে শির্ক এর মাঝে আছে। আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস এই যে, 'পৃথিবীর সকলেই যদি আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সমস্ত দায়-দায়িত্বের ভার বহন করবেন। আমাদের ওপর সামান্যও বোঝা পড়বে না। বন্ধুদের আগমনে তো আমরা বড় আনন্দ বোধ করি। এটি একটি সন্দেহ যা অন্তর থেকে বের করে ফেলা উচিত। আমি কোন লোককে বলতে শুনেছি, 'আমরা এখানে বসে বসে হুযূর (আ.)-কে কেন কষ্ট দেব? আমরা তো অপদার্থ! এমনেই বসে বসে রুটি খেয়ে যাব?' তারা যেন স্মরণ রাখে, এটি একটি শয়তানী প্ররোচনা, শয়তান তাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে যেন তাদের পা এখানে থেমে না যায়"। [মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৫]

ঐশী প্রেমিকদের মিলনমেলার জলসায় উপস্থিত আশেকে মসীহ্‌দের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খাস দোয়া করেছেন। এ অবিস্মরণীয় দোয়াটি নিম্নরূপ–

"প্রত্যেক ব্যক্তি যে এ জলসায় শামিল হবার জন্য সফরে বেরিয়েছেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন। তাদেরকে অনেক পুরস্কার দান করুন। তাদের প্রতি দয়া করুন। তাদের কষ্ট, তাদের উদ্বেগকে দূর করে, অবস্থাকে তাদের জন্য সহজ করুন। তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করুন। তাদের সকল কষ্ট দূর করে দিন। তাদের উদ্দেশ্য সফলের জন্য পথ তাদের খুলে দিন। পরকালে তাদেরকে আল্লাহ্ নিজ প্রিয় বান্দাদের সঙ্গী করে দিন, যাদের প্রতি তাঁর ফযল ও রহম রয়েছে। তাদের যাত্রা শেষে তাদের পরে তাদের খলীফা হোন। হে আল্লাহ্! হে বুযুর্গী ওয়ালা দানশীল এবং রহীম ও কষ্ট দূর করেন যিনি, এ সমস্ত দোয়া কবুল কর। আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর সাহায্যে আমাদেরকে বিজয় দান কর। প্রত্যেক প্রকার ক্ষমতা তোমার আছে। সকল শক্তিই তোমার আছে, আমীন, সুম্মা আমীন। (ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর ১৮৯২ মজমুআ ইশতেহারাত, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪২)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-জীবদ্দশায় আরও জলসা (১৮৯২-১৯০৮)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক কাদিয়ানে রোপিত জলসার ধারাবাহিকতায় ১৮৯২ সালের ২৬-২৮ ডিসেম্বর দ্বিতীয় সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৬ সালে লাহোরে সর্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রণীত 'ইসলামী উসুল কি ফিলাসফি' নামক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের নিকট প্রবন্ধটি প্রশংসিত হয় এবং অন্যান্য প্রবন্ধের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। ২৬-২৮ ডিসেম্বর এ সম্মেলন অনুষ্ঠানের কারণে সেই বছর সালানা জলসা করা হয়নি।

১৯০০ সালের ২৬-২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম সালানা জলসা। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অসুস্থতার কারণে মাত্র একবার ভাষণ দান করেন। এতে ১৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৯০১ সালের নবম

সালানা জলসায় অনেক লোকের সমাগম হয়। জুমুআর নামাযে মসজিদে স্থান সংকুলান হয়নি। তাই মসজিদের বাইরে নামাযের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯০৫ সালের ১২তম জলসার বিশেষত্ব ছিল–বেহেশতী মাকবেরার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আঞ্জুমান গঠন করা হয়। এর নাম রাখা 'আঞ্জুমান কারপরদাজ মাসালেহ বেহেশতী মাকবেরা'। এ জলসায় উপস্থিত ছিলেন ৫০০ জন। ১৯০৬ সালের ১৩তম জলসায় ৫০০ জন যোগদান করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের শেষ জলসা ২৬-২৮ ডিসেম্বর ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়। হুযূর (আ.) ২৬ তারিখ প্রাত: ভ্রমণে বের হন। তখন অনেক শিষ্য তাঁর নিকট সমাগম হয়। হুযূর (আ.) একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়ান। দু'ঘন্টা ধরে ভক্তরা তাঁর সাথে মুসাফাহা করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

২৭-২৮ তারিখ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাযকিয়ায়ে নাফস বা আত্মশুদ্ধি বিষয়ে জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য রাখেন। ২৮ তারিখ তিনি (আ.) বলেন–'জীবনের কোন ভরসা নেই। আজ এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন, এদের মাঝে কে আগামী বছর জীবিত থাকবে, আর কে মারা যাবে তা জানা নেই'। এ জলসায় ৭০০ জন আশেকে মসীহ্ অংশগ্রহণ করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় ১৭ বার জলসার সময় আসে। এর মধ্যে ১৮৯৩, ১৮৯৬ ও ১৯০২ তিন বছর ব্যতীত ১৪ বার জলসা অনুষ্ঠিত হয় এবং হুযূর (আ.) প্রতিবার জলসায় উপস্থিত থেকে নসিহতমূলক ভাষণ দানে কল্যাণমন্ডিত করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বে ১৮৮২ সালে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে জানান– "মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে তোমার নিকট আসবে এবং এত অধিক সংখ্যক আসবে যে, তাদের যাতায়াতের দরুন রাস্তা গর্ত হয়ে যাবে এবং খোদা তা'লার সাহায্যও বহু দূর হতে তোমার নিকট আসবে, তোমার নিকট এত লোক আসবে যার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব হবে। কিন্তু তুমি লোকাধিক্যে ব্যতিব্যস্ত হবে না। মুখ মলিন করবে না এবং রুক্ষভাবাপন্ন হবে না এবং তোমার ঘর আরও উন্মুক্ত ও প্রসারিত করবে, যেন আগুন্তকরা আরাম করতে পারে।" (বারাহীনে আহমদীয়া, ৩য় খন্ড)।

তিনি (আ.) যখন এই ইলহাম প্রাপ্ত হন তখন অনেকে তাঁকে হাসি-ঠাট্টা করে। কেননা তখন তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু যখন ১৮৮৯ সালে আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলে দাবি করেন এবং ১৮৯১ সাল থেকে সালানা জলসা প্রবর্তন করা হয়। তখন শত শত লোক কাদিয়ানে আসতে শুরু করে। ফলে এ ইলহাম বাস্তবায়িত হয়। উপরন্তু হুযূর (আ.)-এর ওফাতের পর কুদরতে সানিয়ায় জলসা অনুষ্ঠানের ক্রমধারায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের সমাগম বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

প্রথম খিলাফত কাল (১৯০৮-১৯১৪)-এর জলসা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর খিলাফতকালে ৬টি জলসা রীতিমত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯০৯ সালের সালানা জলসা অনিবার্য কারণে ১৯১০ সালে ২৫-২৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯১০ সালের জলসা ২৫-২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিতি ১৯০৮ সালে ২৫০০, ১৯১০ সালে ২৫০০, ১৯১২ সালে ২০২৫ এবং ১৯১৩ সালে ৪০০০ জন ছিলেন।

দ্বিতীয় খিলাফত কাল (১৯১৪-১৯৬৫)-এর জলসা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর খিলাফত কাল যেমন সর্বাধিক তেমনি তাঁর সময় জলসা অনুষ্ঠানের সংখ্যাও সর্বাধিক। তাঁর খিলাফত শুরু থেকে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত ৩৩ টি সালানা জলসা কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯১৪ সালের জলসায় ৩৯০০ জন উপস্থিত হন। এতে প্রথমবারের মত মহিলারা অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করা হয়। এছাড়া ১৯১৬ সালে ৫০০০, ১৯১৯ সালে ৭০০০, ১৯২০ সালে ৭০০০, ১৯২১ সালে ৭১৯২ এবং ১৯২২ সালে ৯০০০ জন আশেকে মসীহ্ জলসায় যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেন।

১৯১৭ সালে মহিলাদের জন্য পৃথক জলসার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২২ সালে লাজনা ইমাইল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবার লাজনার ব্যবস্থাধীনে হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.)-এর বাড়িতে প্রথম জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬ সালের জলসায় প্রথম লাউড স্পিকার ব্যবহার করা হয়। জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় ১৯২৩ সালে ১২০০০, ১৯২৪ সালে ১৫০০০, ১৯২৫ সালে ১৫০০০, ১৯২৬ সালে ১২১১৭, ১৯২৭ সালে ১৩০২০, ১৯২৮ সালে ১৬৮৭৫, ১৯২৯ সালে ১৭৩১৬, ১৯৩১ সালে ১৮৭৭৬, ১৯৩২ সালে ২০৭৫৩, ১৯৩৩ সালে ২৯১৪৩, ১৯৩৬ সালে ২১২৭৮ এবং ১৯৩৮ সালে ৩০০৩৩ জন অংশগ্রহণ করেন। বর্ষ পরিক্রমায় দেশ বিদেশ থেকে আশেকে মসীহ্রা হৃদয়ের টানে কাদিয়ানে ছুটে আসেন। পরিণত হয় ঐশী প্রেমিকের মিলন মেলার হাট। ঐশী নূরে পরিস্ফুটিত হয়ে ফুটে উঠে আধ্যাত্মিকতার সুরভিত পুষ্পকানন।

১৯৩৯ সালের জলসা ছিল খিলাফত জুবিলী জলসা। এ বছর ইসলামের পুনরুত্থানের জামা'তে আহমদীয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর গৌরবময় খিলাফতের ২৫ বছরের পূর্ণতা এবং হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কীর্তিমান জীবনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার অর্ধ শতাব্দী অতিক্রমের সাল। তাই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ১৯৩৯ সালে খিলাফত জুবিলী উৎসব পালনের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ বর্ণালী উৎসব পালনে মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে হযরত স্যার চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রা.) ছিলেন।

কাদিয়ানের জলসা অন্যান্য বছর ৩ দিনের জন্য হলেও এ জুবিলী জলসা ২৬-২৯ ডিসেম্বর ৪ দিনের জন্য করা হয়। কর্মসূচি অনুসারে ২৮ ডিসেম্বর প্রত্যেক জামা'ত বিভিন্ন পুণ্য বাক্য খচিত স্ব স্ব পতাকাসহ তসবীহ্, তাহমীদ, তকবীর ও নযম গেয়ে মিছিল করে জলসাগাহে উপস্থিত হন। মিছিলের পুণ্য বাক্য খচিত ১৫০ টি পতাকা জলসাগাহের গ্যালারিতে একে একে সাজিয়ে রাখা হয়। ফলে এক মনোরম দৃশ্যপট সৃষ্টি হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে অভিনন্দন প্রদান অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের জামা'ত কর্তৃক অভিনন্দন পত্র পাঠ করে

শুনানো হয়। হুযূর সানী (রা.) পাঠকৃত বিভিন্ন অভিনন্দন পত্রের উত্তর প্রদান করেন এবং চীন দেশের অভিনন্দন পত্রটি বিশেষ পছন্দ করেন। হুযূর (রা.) ২৮ ডিসেম্বর নারায়ে তকবির ধ্বনী প্রদানের মাঝে জামা'তে আহমদীয়ার পতাকা, খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা এবং লাজনাদের পতাকা উত্তোলন করেন এবং হযরত চৌধুরী স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ জুবিলী উপলক্ষে জামাতের পক্ষ থেকে হুযূর সানী (রা.)-এর খেদমতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার ১টি চেক উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করেন। জামা'তের বিশিষ্ট আলেমগণ বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। ফলে ৩৯৯৫০ জন আশেকে মসীহের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত জলসা সার্থক ও সফল হয়।

কাদিয়ানে জলসা অনুষ্ঠানের ক্রমধারায় ১৯৪১ সালে ২৭২০৯, ১৯৪৩ সালে ২৭২৫৬ এবং ১৯৪৪ সালে ২৩৬০০ জন যোগদান করেন।

১৯৪৪ সালের জলসা আহমদীয়াতের ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক ও গৌরবের জলসা। কারণ এ বছর আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে জানান– তিনিই মুসলেহ্ মাওউদ। ফলে তিনি (রা.) এ জলসায় যে বক্তব্য রাখেন এতে শপথ পূর্বক এ বিষয় উপস্থাপন করে বলেন–'আমি ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত মুসলেহ্ মাওউদ। এ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্রের যে ৫২ টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তা আমার মাঝে পূর্ণ হয়েছে'। ৪ ঘন্টা ব্যাপী তিনি (রা.) বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৪৫ সালের জলসায় ২৩৪৩৫ এবং ১৯৪৬ সালের জলসায় ৩৩৪৮৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কাদিয়ান থেকে পাকিস্তান হিজরতের পর ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালের জলসা লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ২৭-২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জলসায় উপস্থিতি সীমিত রাখার জন্য সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় এবং মহিলাদের যোগদান বারণ করা হয়। ফলে এ জলসায় ১০৯৪৫ জন উপস্থিত হন। ১৯৪৮ সালের ২৫-২৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জলসায় ১৭০০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

রাবওয়ায় প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় ১৫-১৭ এপ্রিল ১৯৪৯ তারিখ। এতে উপস্থিত ছিলেন ২০২২০ জন। রাবওয়া জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় ১৯৫০ সালে ৩০৪৯২, ১৯৫১ সালে ৩১৪২১, ১৯৫৩ সালে ৩১৬৩০, ১৯৫৫ সালে ৫০০০০, ১৯৫৬ সালে ৬০০০০ এবং ১৯৫৭ সালে ৭০০০০ জন যোগদান করেন। ১৯৫১ সালের জলসায় প্রথম রেকর্ডিং করা হয়।

১৯৫৮ সালের জলসায় উপস্থিতির সংখ্যা ১ লক্ষ। এতে প্রথমবারের মত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৯ সালের জলসা নির্বাচনের কারণে জানুয়ারি ১৯৬০ সালে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসেও জলসা রীতিমত অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিতি ৭০০০০ জন। ১৯৬১ সালে হুযূর (রা.) অসুস্থতার কারণে জলসার উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দিতে পারেন নি। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ (রা.) হুযূর (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে ভাষণ দেন। এ জলসায় উপস্থিত হয় ১ লক্ষ। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের শেষ জলসা ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়। তখন হুযূর (রা.) অসুস্থতার জন্য যোগদান করতে পারেন নি। হুযূরের প্রারম্ভিক ও শেষ বাণী পাঠ করার সৌভাগ্য লাভ করেন হযরত মাওলানা জালাল উদ্দীন শামস (রা.)।

তৃতীয় খিলাফত কাল (১৯৬৫-১৯৮২)-এর জলসা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর খিলাফতকালে ১৯৬৫ সালের ১৯-২১ ডিসেম্বর প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ৮০০০০ জন। রেডিও পাকিস্তানের জাতীয় সংবাদে এ জলসার খবর প্রচারিত হয়। ১৯৬৬ সালের জলসা রমযানের কারণে ২৬-২৮ জানুয়ারি ১৯৬৭ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ৮৫০০০ জন। ১৯৬৭ সালের জলসা ১৯৬৮ সালের ১০-১২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ১ লক্ষ। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরের জলসা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭১ সালে যুদ্ধের কারণে জলসা হয়নি। ১৯৭৩ সালের জলসায় হুযূর (রাহে.) জামাতে আহমদীয়ার শতবার্ষিকী জুবিলী (১৮৮৯-১৯৮৯) উদযাপনের ঘোষণা দেন। উপস্থিত ছিলেন সোয়া লক্ষ। ১৯৮০ সালের ২৬-২৮ ডিসেম্বর ১৫ শতাব্দীর প্রথম জলসা হয়। ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় খিলাফতের শেষ জলসা। এতে উপস্থিত ছিলেন ২ লক্ষ। তৃতীয় খিলাফতের সব জলসা রাবওয়ার মসজিদে আক্সার প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চতুর্থ খিলাফত কাল (১৯৮২-২০০৩)-এর জলসা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর খিলাফত কালের শুরুতে ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে কেন্দ্রীয় জলসা রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ২ লক্ষ ২০ হাজার এবং পৌনে ৩ লক্ষ। অতঃপর পাকিস্তানে সরকারি আইনগত কারণে আর সালানা জলসা করা সম্ভব হয়নি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আল্লাহ্ তা'লার ঐশী নির্দেশে ১৯৮৪ সালে পাকিস্তান থেকে লন্ডনে হিজরত করেন। তখন বৃটেনের পূর্ব নির্ধারিত ১৯তম জলসা হুযূর রাবে (রাহে.)-এর উপস্থিতিতে ২৫ ও ২৬ আগষ্ট ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ৩০০০। অতঃপর এই জলসা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। লন্ডনে আন্তর্জাতিক ভাবে জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হয়। ১৯৮৫ সালের ৫-৭ এপ্রিল টিলফোর্ডের ইসলামাবাদ নামক স্থানে জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪৮ টি দেশের ৭০০০ লোক উপস্থিত হন। ১৯৮৭ সালের জলসায় প্রথম বারের মত বিভিন্ন দেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ৭০০০ জন। ১৯৮৮ সালে ১১৭ টি দেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ৫১১৯ জন। জলসার বক্তৃতায় হুযূর (রাহে.) মোবাহালার চ্যালেঞ্জ দেন। ১৯৮৯ সালে শতবার্ষিকী জুবিলী জলসা পালিত হয়। এ জলসায় ১৪০০০ জন আশেকে মসীহ্ অংশগ্রহণ করেন।

বৃটেনের জলসায় ১৯৯৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক বয়আত শুরু হয়। যা এমটিএ-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে এক যুগে আহমদীরা অংশ নেন। ২০০০ সালের ৩৫তম জলসায় উপস্থিত ছিলেন ২৩৪০৭ জন। ২০০১ সালের জলসা লন্ডনের পরিবর্তে ২৪-২৬ আগষ্ট জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ৪৮১০৯ জন। চতুর্থ খিলাফতের শেষ জলসা ২০০২ সালের ২৬-২৮ জুলাই লন্ডনের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। ৭৪ টি দেশের ১৯৪০০ জন যোগদান করেন।

(চলবে)

গিবত একটি জঘন্য পাপ

মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন
মুরব্বী সিলসিলাহ

(৯ম কিস্তি)

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) গিবত সম্পর্কে আরো বলেন, সভা-সমাবেশের আমানত যদি রক্ষা করা না হয় তাহলে এটিও গিবত হয়ে যায়। আমরা যখন পরস্পর সাক্ষাৎ করি একে অপরের সাথে কথা বলি তখন কোন ব্যক্তি গিবতের উদ্দেশ্যে নয় বরং রেফারেন্সের কারণে কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে থাকে। যা সবাই জানে, তার কোন গোপন মন্দ বিষয় বলা হয় না যা সে জানে না বরং কোন কথাবার্তার বরাত দিয়ে এই কথা শুরু হয়ে যায়। যদি কোন ব্যক্তি এই কথাকে নেয় এবং তা বাইরে বলতে থাকে তাহলে এটি আমানতের খেয়ানত। কেননা এগুলো আমানত স্বরূপ আর তার কথা তার অনুমতি ব্যতীত বাইরে বলা একটি গুনাহ। আর এটিও একটি বিষয় যে, এ ব্যাপারে অনেক সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু আমি একটি মূল নীতি বলে দিচ্ছি যে, কোথায় আমানত রয়েছে, কোথায় এমন একটি নসিহত রয়েছে যা মানবজাতির কল্যাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত, ভালোর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব কথা যা শুনে ঈমান তাজা হয়। অতএব এগুলো সেইরকম আমানত নয় যা আপনি অনুমতি ছাড়া বর্ণনা করতে পারেন না। এ সম্পর্কে বলেছেন– যারা উপস্থিত রয়েছে তারা যেন অনুপস্থিতদের একথা বলে কেননা ভালো কথা আর এর পরিণামে কল্যাণ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যদি এই সভায় কোন এক ব্যক্তির কথা হয়েছে আর এটিকে যদি অন্যের সাথে বলা হয় তাহলে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি হবে তাই এটিকে অন্যের মাঝে বর্ণনা করা অবৈধ এবং তার কাছে এই কথা পৌঁছানোও অবৈধ। যদি একান্ত অপারগতায় কথা বলতে হয় তাহলে আবশ্যকীয় যে তার থেকে যেন অনুমতি নেয়া হয় যিনি সভায় একথা বলেছিলেন। যদি আমরা পুরোপুরি ভাবে এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাই তাহলে গিবতের সকল রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। (খুতবা জুমুআ ১৮ই নভেম্বর ১৯৯৪, আল ফযল ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৯৪, ১৫ই মার্চ ২০০১)

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এখানে যে নীতির কথা উল্লেখ করেছেন আমাদের এটি সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের দ্বারা যেন কখনও কারো গিবত না হয়। কেননা গিবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা পূর্বে জেনে এসেছি। আমরা যে সভা বা সেমিনার করে থাকি এগুলোতেও আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। আমরা যেন সভার মাঝে কারো গিবত না করি এবং সভার কথাবার্তা যেন গিবতের উদ্দেশ্যে বাইরে না বলি। হাদীস শরীফেও এসেছে যে, "আল মাজালিসু বিল আমানাতে" অর্থাৎ সভা বিশ্বস্ততার সাথে হওয়া উচিত।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ৩১ জুলাই ১৯৯১ যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। হুযূর (রাহে.) বলেন– রসূল করীম (সা.) এর কথা অনেক সংক্ষিপ্ত হত কিন্তু তা অত্যন্ত গভীর হত এতে তত্ত্বজ্ঞানের সমুদ্র বিদ্যমান থাকত, এটি আঁ হযরত (সা.) এর শান।

হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস মানুষ যদি নিজের অজান্তে এমন কোন কথা বলে যা আল্লাহ্ তা'লার নিকট পছন্দনীয় হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করেন। হযরত সাহেব বলেন– মনের অজান্তে কথা বলার মাঝেও নিজ সত্ত্বার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মনে যদি ভালো কথা থাকে তাহলে বাইরে তা প্রকাশ পাবে। অন্যদিকে মানুষ কোন কোন সময় অসাবধানতাবশত মন্দ কথা বলে বসে কিন্তু তার মনে এমনটি ছিল না। এমন কথাবার্তা থেকে আমাদের বেঁচে চলতে হবে। অন্য একটি হাদীসের বরাত দিয়ে হুযূর মুক্তির তিনটি পথের উল্লেখ করেন এবং বলেন- নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখো। সে কথাই বলো যা বাস্তবেই সত্য, তোমার ঘর তোমার জন্য যথেষ্ট। বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন যারা ঘরে প্রশান্তি পায় তাদের জন্য তাদের ঘরই যথেষ্ট। এ কারণে বলা হয়েছে যে সেখানেই তোমাদের সন্তানদের মুক্তি নিহিত। তারপর বলেন– নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য অশ্রু ঝরাতে থাক।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে যে সবচেয়ে মন্দ লোক সে ব্যক্তি যে দুমুখো। এর অর্থ হলো একজনের সাথে কথা বলার জন্য এক মুখ আর অন্যদের সাথে কথা বলার জন্য অন্য মুখ। একজনকে এক কথা বলে আর অন্যজনকে অন্য কথা, তাহলে সে হবে বড় মুনাফেক। হযরত সাহেব বলেন- এটি একটি বড় ধরনের অসুস্থতা এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজেদের পর্যালোচনা করতে থাকুন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রসূল করীম (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কতক বাহ্যত মু'মিন কিন্তু ঈমানে দৃঢ় নয়। তাদের সতর্ক করো যেন

কাউকে কষ্ট না দেয়। যারা অন্যের দোষক্রটি খুঁজে বেড়ায় আল্লাহ্ তা'লা তাদের দোষক্রটি অন্যের মাঝে প্রকাশ করে দেয়। হযরত সাহেব বলেন, যখন অন্যের দোষক্রটি বর্ণনা করো তখন স্মরণ করো যে তোমার মাঝেও দোষক্রটি রয়েছে যা খোদা তা'লার সাত্তারিয়্যাতের পর্দায় রয়েছে। সেই সমস্ত দোষক্রটি যা পূর্বে প্রকাশিত ছিলনা তা লোকদের সামনে প্রকাশিত হতে থাকবে।

হুযূর (রাহে.) বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা.)থেকে বর্ণিত রসূল করীম (সা.) বলেন, অন্যের সামান্য বিষয় চোখে ধরা পড়ে অথচ নিজের বড় বিষয়ও সে ভুলে যায়। এর অর্থ এটি যে তোমার ভাইয়ের যত মন্দ বিষয় তোমার সামনে পরিলক্ষিত হয় এর চেয়ে বেশি মন্দ বিষয় তোমার মাঝে রয়েছে। নিজ সত্ত্বার হিসাব নিকাশ করতে থাকো যদি তোমরা অন্বেষণ করো তাহলে দেখবে যে এই রকম মন্দ বিষয় বা এর চেয়ে বড় ধরনের খারাপ বিষয় তোমাদের মাঝে রয়েছে।

বাস্তব হলেও সত্য যে আমাদের চোখে আমাদের নিজেদের দোষক্রটি ধরা পরে না। দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত অনেক ভুল কাজ করে থাকি। তারপরও আমরা অন্যের দোষক্রটি খুজে বেড়াই। এটি করার আমাদের কোন অধিকার নেই যে আমরা অন্যের দোষক্রটি খুঁজে বেড়াই। আমাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার এটি অপার অনুগ্রহ যে তিনি আমাদের গুনাহসমূহ ও দুর্বলতাসমূহকে সাত্তারিয়্যাতের পর্দার মাঝে ঢেকে রাখেন। কিন্তু আমরা যদি অন্যের দোষক্রটি খুঁজে বেড়াই আর তা মানুষের মাঝে প্রকাশ করতে থাকি তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও আমাদের দোষক্রটি অন্যের সামনে প্রকাশ করবেন। আমাদের সব সময় নিজেদের নিয়ে পর্যালোচনা করা উচিত যেন আমরা ভুলেও কখনো কারো গিবত না করি এবং কারো মনে কষ্ট দিয়ে কথা না বলি।

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন– গিবত হলো কারো সম্পর্কে কোন সত্য কথা তার অনুপস্থিতিতে বলা, যদি সে সেখানে উপস্থিত থাকত তাহলে সে এ কথার দ্বারা কষ্ট পেত। গিবত অর্থ মিথ্যা বলা নয় বরং সত্য কথা বলা যা কষ্ট পৌঁছায় তা গিবত। তিনি বলেন, যে কথা বলা হয়েছে তা যদি সে ব্যক্তির মাঝে না থাকে তাহলে সেটি হবে অপবাদ, গিবত নয়। মিথ্যা কথা থেকে সে দু'টি গুনাহ অর্জন করবে একটি মিথ্যা আর অপরটি গিবত।

তিনি বলেন, নেকি এবং তাক্ওয়ায় উন্নতি করো। খোদার অনুগ্রহ এই পথ থেকেই আসে। রসূল করীম (সা.) এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করুন, কুরআন করীমকে জীবন বিধান বানিয়ে নেন আর যদি এভাবে আমল করতে পারেন তাহলে সমস্ত পৃথিবী একত্রিত হয়েও যদি আপনাকে ধ্বংস করতে চায় ধ্বংস করতে পারবে না। যদি খোদা তা'লা আমাদের সাথে থাকেন তাহলে কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর একটি উদ্ধৃতি এমন ছিল যে, "নোংরা হৃদয় হতে নোংরা কথাই বের হয় এবং পবিত্র হৃদয় হতে পবিত্র কথা বের হয়। ফল দ্বারাই বৃক্ষের পরিচয় জানা যায়।" তিনি (আ.) আহমদীয়াত বৃক্ষের ফল, খোদা তা'লা করুন যেন আপনার মাধ্যমে আহমদীয়াত এভাবে পরিচিতি লাভ করুক যেভাবে ফল দ্বারা বৃক্ষের।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন– তোমরা গিবত থেকে নিজেদের সুরক্ষা করো। কুরআন করীমে গিবতকারীকে নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণকারী হিসেবে আখ্যায়িতি করা হয়েছে। লোকেরা গিবতের মাহফিলে বসতে অনেত আনন্দ পায়। যে অনুপস্থিত থাকে সে মৃত ভাই স্বরূপ আর মৃত কখন নিজের রক্ষা করতে পারে না। ঠিক তদ্রুপ মহিলাদের মাঝে বাড়িয়ে বলার অভ্যাস থাকে। পুরুষদের মাঝেও এই অভ্যাস থাকে। কিন্তু মহিলাদের মাঝেই বেশি থাকে। জাতি বা গোত্রের অহংকার মহিলাদের মাঝেই বেশি থাকে এটি বলা যে অমুক তো নীচু জাতের। অমুককে দেখো কেমন কাপড় পরিধান করে আছে। আল্লাহ্ তা'লা এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য থেকে সকলকে রক্ষা করুন।

হুযূর (রাহে.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মলফুযাতে এই সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মহিলাদের মাঝে কিছু কিছু দোষক্রটি অনেক বেশি রয়েছে। যেমন– চাপাবাজি করা, জাতি নিয়ে গর্ব করা, অমুক নিম্ন শ্রেণীর বা নীচু জাতের, গরীব মহিলাদের ঘৃণা করা এবং তাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলা যে তার কাপড় কত নোংরা ইত্যাদি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন এটি কখনই কুরআন করীমের শিক্ষা হতে পারে না। বলেন, ধৈর্য ও অনুগ্রহের সাথে নসীহত করো। অন্যের দোষক্রটি দেখে তা দূর করার জন্য দোয়া করো। দোয়ার মাঝে অনেব প্রভাব রয়েছে। দোষক্রটি তো একশবার বলে থাক কিন্তু একবারও দোয়া করো না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শেখ সাদী (রহ.) এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, খোদা তা'লা তো দোষক্রটি জানার পরও তা ঢেকে রাখেন। কিন্তু প্রতিবেশি জানেও না তারপরও বাইরে বলে যে এই ঘরে এটি হয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে গিবত পরিহার করার তৌফিক দান করুন।

(চলবে)

যারা অন্যের দোষক্রটি খুঁজে বেড়ায় আল্লাহ্ তা'লা তাদের দোষক্রটি অন্যের মাঝে প্রকাশ করে দেয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'অন্যের সামান্য বিষয় চোখে ধরা পড়ে অথচ নিজের বড় বিষয়ও সে ভুলে যায়।'

আমাদের সব সময় নিজেদের নিয়ে পর্যালোচনা করা উচিত যেন আমরা ভুলেও কখনো কারো গিবত না করি এবং কারো মনে কষ্ট দিয়ে কথা না বলি।

নবীনদের পাতা-

প্রাকৃতিক দুর্যোগ না ঐশী আযাব?

আলামিন আহমদ
ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, "আর যারা (তোমার বিরুদ্ধে) হীন ষড়যন্ত্র করে আসছে তারা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে যে আল্লাহ্ ভূমিধসে তাদের বিলীন করে দিবেন না বা তাদের কাছে এমন পথে আযাব আসবে না যা তারা অনুমানও করতে পারবে না"। (সূরা আন নাহল ঃ ৪৬)

আমাদের ওপরে প্রতিনিয়ত আপতিত হওয়া এগুলো কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ না খোদা তা'লার ঐশী আযাব? আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে তো শুধুমাত্র ভূমিধসকে ঐশী আযাব বলে উল্লেখ করেছে। অনেক আপত্তিকারীরা এ কথা বলবেন যে, এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঐশী আযাব হতে পারে না। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা কোন সতর্ককারী প্রেরণ করি। আল্লাহ্ কি মানবজাতিকে উদ্ধারের জন্য কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেন নি? অবশ্যই করেছেন। আজ থেকে ১১৬ বছর পূর্বে কাদিয়ানে নিজেকে খোদা তা'লার প্রেরণকৃত একজন সতর্ককারী হিসেবে নিজেকে দাবী করেছেন। নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী হিসেবে দাবী করেছেন। তিনি আর কেউ নন। পারশ্য বংশীয় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। যার সত্যতার সাক্ষ্য দেয় ১৮৯৪ এবং ১৮৯৫ সালের রমযান মাসের চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ। তিনি (আ.) পৃথিবীবাসীকে সাবধান করে বলেন, "হে ইউরোপ তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীগণ কোন কল্পিত খোদা তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি আর জনপদগুলোকে জনমানবশুন্য প্রত্যক্ষ করছি। সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল নীরব থেকেছেন, তাঁর চোখের সামনে ঘৃণ্য কাজ-কর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শ্রবণ করুক সে সময় দূরে নয়। আমি সবাইকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি....."। [রূহানী খাযায়েন, ২২ খণ্ড-পৃঃ ২৫১]

এখন আমি খোদা তা'লার আযাব সম্পর্কে বর্ণনা করব এক্ষেত্রে প্রথম যেটি আসে সেটা হলো–

১. ***মুষলধারে বৃষ্টি***-খোদা তা'লার আযাবের মধ্যে সর্বপ্রথম যেটি আসে তা হলো মুষলধারে বৃষ্টি। এ ব্যাপারে খোদা তা'লা বলেন, "তাদের পূর্বে নূহের জাতিও প্রত্যাখ্যান করেছিলো আর তারা আমাদের বান্দাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং বলেছিল সে তো এক বদ্ধ উন্মাদ এবং বিতাড়িত (এক ব্যক্তি)। তখন সে তার প্রভু-প্রতিপালককে ডেকেছিলো, 'নিশ্চয় আমি পরাস্ত হয়ে গেছি। অতএব তুমি আমাকে সাহায্য করো। তখন আমরা অবিরাম বর্ষণরত পানির মাধ্যমে আকাশের দুয়ার খুলে দিলাম। আর আমরা ঝরণার আকারে ভূমিকে বিদীর্ণ করে দিলাম অতএব পানি এরূপ এক উদ্দেশ্যে একত্র হয়ে গেল যা আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল।

[সূরা কামার ঃ ১০-১৩]।

২. ***তীব্র ঝড় বায়ু–*** এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আদ জাতিও প্রত্যাখ্যান করেছিলো। সুতরাং (দেখ) কিরূপ ছিল আমার আযাব ও সতর্কীকরণ। নিশ্চয় আমরা এক দীর্ঘস্থায়ী অশুভ দিনে তাদের ওপর এক প্রচন্ড গতিসম্পন্ন বায়ু পাঠিয়েছিলাম। যা মানুষকে মুলোৎপাটিত খেজুর গাছের কান্ডের ন্যায় আছড়ে ফেলছিলো।

[সূরা কামার ঃ ১৯-২১]

৩. ***উদগীরণ/বিস্ফোরণ–*** এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "এরপর সকাল হতেই সেই (প্রতিশ্রুত) বিকট শব্দের আযাব ধরে ফেললো। অতএব আমরা এ শহরকে লন্ডভন্ড করে দিলাম এবং তাদের ওপর কঙ্করজাত পাথর বর্ষণ করলাম। [সূরা হিজর ঃ ৭৪-৭৫]

৪. ***বালু ঝড়***- এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "এ (ঝড়ো বাতাস) নিজ প্রভুর আদেশে সবকিছু ধ্বংস করে দিবে। এভাবে তারা (ধ্বংস) হয়ে গেল যে তাদের ঘরদোর ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এরূপেই আমরা অপরাধী জাতিকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। [সূরা আহক্বাফ ঃ ২৬]।

৫. ***বন্যা***- এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "কিন্তু তারা মুখ ফিরিয়ে রাখলো। তখন আমরা তাদের ওপর এক ভাঙ্গাবাধ (থেকে এক) প্রচন্ড প্লাবন পাঠালাম। তাদের বাগানগুলোর পরিবর্তে আমরা তাদের এমন দু'টি বাগান দিলাম যেগুলোতে তিতা ফল এবং ঝাউ এবং কিছু কুল গাছ ছিল। [সূরা সাবা ঃ ১৭]

৬. ***ভূমিকম্প***- আল্লাহ্ তা'লার আযাবের মধ্যে অন্যতম একটি হল ভূমিকম্প। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তবুও তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলো এবং এর (উটনীর) পিছনের পায়ের রগ কেটে দিল। অতএব, তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের পাপের দরুন তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিলেন এবং তাদেরকে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন।

৭. ***অনাবৃষ্টি***- এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা

আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল প্রেরণ করি।

বলেন, "তুমি বল, তোমাদের (সব) পানি অনেক গভীরে নেমে গেলে তোমরা বলতো দেখি কে তোমাদের জন্য (স্বচ্ছ) বহমান পানি এনে দিবে? [সূরা মূলক ঃ ৩১]

৮. ***দূর্ভিক্ষ-*** আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আর আল্লাহ্ এমন এক জনপদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যা নিরাপদে ও শান্তিতে ছিল। সবদিক থেকে এর রিযক পর্যাপ্ত পরিমাণে এখানে আসতো। তবুও এ (জনপদবাসী) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজী অস্বীকার করলো। তাই আল্লাহ্ এদের কৃতকার্যের দরুন এ (জনপদকে) ক্ষুধা এবং ভয়ের আচ্ছাদনে জড়ানো এক জীবনের স্বাদ গ্রহণ করালেন। [সূরা নাহল ঃ ১১৩]

৯. ***যুদ্ধ-বিগ্রহ-*** এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আর আমরা যে জনপদেই নবী পাঠিয়েছি এর অধিবাসীদেরকে আমরা অবশ্যই অভাব অনটন ও দুঃখকষ্টে জর্জরিত করেছি যাতে তারা আকুতি মিনতি করে। [সূরা আ'রাফ ঃ ৯৫]

আর এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে আল্লাহ তা'লা ইলহাম করে জানিয়েছেন, যেমন তিনি (আ.) বলেন, "আমার ওহীর মধ্যে বাহ্যত যালযালা তথা ভূমিকম্প শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে অবশ্যই এটা সম্ভবপর যে, এই ভূমিকম্প শব্দের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত এটাই যে মানবজাতির জন্য এমন কিছু গুরুতর ধ্বংসলীলাও সংঘটিত হতে থাকবে যা কিনা ভূমিকম্প সদৃশ সর্বগ্রাসী ধ্বংসের রূপ ধারন করে মানুষের বসতবাড়ির উপরেও তা পতিত হবে। [বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩]

১০. ***পঙ্গপাল-*** এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা সূরা ফীলে বলেন, আর তিনি তাদের ওপর ঝাকে ঝাকে পাখী পাঠিয়েছিলেন। যারা শুকনো মাটির শক্ত পাথরে তাদেরকে আছড়ে মারছিল। (সূরা ফিল)

১১. ***বাঁধ ভেঙ্গে ফেলা–*** এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "অবশেষে তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের ওপর আযাবের কষাঘাত হানলেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক (তাদের ধরার জন্য) ওৎ পেতেছিলেন। (সূরা ফজরঃ ১৪-১৫) এখানে সাওতা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার একটি অর্থ হচ্ছে যেখানে পানি জমা করে রাখা হয়। [আকরাবুল মাওয়ারিদ]

১২. ***মড়ক–*** এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আমরা তখন তাদের ওপর ঝড়তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত (ক্ষরণজনিত বিপর্যয়) পাঠালাম" [সূরা আ'রাফ ঃ ১৩৪]।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন আগমন করলেন তখন দুনিয়াবাসী তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাই তাঁর (আ.) সত্যতার সাক্ষ্য হিসেবে তৎকালীন সময়ে প্লেগ প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে (আ.) এও জানান যে, শুধু ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র পৃথিবীতেই আল্লাহ্ প্লেগ বিস্তার করবেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে প্লেগ সম্পর্কে ইলহাম করে জানান। যেই প্লেগের কথা আজ থেকে ১৫শ বছর পূর্বে মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন দুনিয়াতে এ ঘোষণা করেন যে, অল্পকিছু দিনের মধ্যেই ভারতে প্লেগ ছড়িয়ে পড়বে তখন তাঁর (আ.) কথা কেউ গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান কেউ কি খন্ডাতে পারে! প্লেগ এতই মারাত্মক রূপ ধারন করেছিলো যে, শুধু পাঞ্জাবেই পাঁচ লক্ষ লোক মারা যায়। বর্তমান যুগেও আজ আমরা বিভিন্ন ধরনের প্লেগের ভয়াবহতা দেখতে পাই। যেমন এবোলা, এইডস, সোয়াইন ফ্লু, বাউ ফ্লু ইত্যাদি আর এগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় একমাত্র খোদামুখি হওয়া, পার্থিবতার মোহ এবং জগতের মরিচীকা থেকে খোদার ইবাদতে মশগুল হওয়া। এছাড়াও আল্লাহ্ কুরআন করীমে আরো এক-প্রকারের শাস্তির কথা উল্লেখ করে তা হলো–

১৩. "আর (স্মরণ কর) তোমার প্রভু-প্রতিপালক যখন ঘোষণা করলেন নিশ্চয় তিনি তাদের বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত এমন লোকদের উত্থান ঘটাতে থাকবেন যারা তাদের ভীষণ শাস্তি দিতে থাকবে। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা। আর নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।" [সূরা আ'রাফ ঃ ১৬৮]

এ বিষয়টি নিশ্চয় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই। কারণ আজ এগুলো আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। আর মানুষ এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিদ্রোহ করছে। নিজ হাতে অস্ত্র তুলে নিচ্ছে। একে-অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। এমনকি যদি তারা স্ব-জাতীও হয়ে থাকে। আর কেউ বা এর নাম দিচ্ছে বিদ্রোহ, কেউ বা বিপ্লব আবার কেউ বলছে আরব বসন্ত। কিন্তু এগুলো যে সংঘটিত হচ্ছে খোদার রসূলকে না মানার কারণে, তাঁর নির্দেশিত পথে না চলার কারণে সেদিকে আমাদের কারো কোন কর্ণপাত নাই। অথচ আল্লাহ্ বলেন, ***"ওয়ামা কুন্না মুয়াযযাবিনা হাত্তা নাবাছা রাসূলা"*** [সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৬] অর্থ ঃ আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল প্রেরণ করি।

অতএব, আজ এই ঐশী শাস্তি শুধুমাত্র খোদার মহাপুরুষকে না মানার কারণেই হচ্ছে। যারা এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে তারাই অবশেষে সফলকাম হয়। আজ বিশ্বের প্রতিটি জায়গায় কোন না কোন ঐশী শাস্তি আঘাত হেনেছে। কোথাও বন্যা বা খরা, কোথাও তুষারপাত বা তীব্র ঠান্ডা, কোথাও ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির লাভা উদগীরণ। কোথাও খোদা তা'লা এমন কাউকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন যারা নিজ জাতির ওপর অত্যাচার-অনাচার করছে। আর এগুলো যা সংঘটিত হচ্ছে তা হচ্ছে স্মরণকালের ভয়াবহ দুর্যোগ। এগুলো সবই আমাদের মনে তরতাজা। কারণ একটার ঘা শুকাতে না শুকাতেই আরেকটা ঘার প্রকোপ দেখা দিচ্ছে। যেমন আমেরিকার তুষার ঝড় বা আফ্রিকার খরা, সবই যেন মেঘের সামনে ভেসে ওঠে।

গত ২৫ এপ্রিল নেপালের ভূমিকম্প এই তো সেদিনের কথা। এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৭৫০০ জন। নিখোজ আরো অনেকে। এ সকল ঘটনা কি একজন মহাপুরুষের আগমনের জন্য সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে না? অথচ কুরআন এদিকে ইঙ্গিত বহন করে. ***"ওয়ামা কুন্না মুয়াযযাবিনা হাত্তা নাবাছা রাসূলা"*** [সূরা বনীইসরাঈল ঃ ১৬]। আমেরিকান জিএস তাদের এক নিবন্ধে বলে, "১৯৯৯ সালে সমগ্র পৃথিবীতে ছোট-বড় ভূমিকম্পের সংখ্যা ২০ হাজারের বেশী। ২০০৭ সালের ইন্দেনেশিয়ার বন্যা যাতে তিনলক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষ গৃহহারা হয়। পরপর দু'বার ভূমিকম্প যার মাত্রা ৬.৪ এবং ৬.৩। সুমাত্রা দ্বীপে ভূমিকম্প। Solomon Islands ভূমিকম্প যার মাত্রা ৮.১। পাকিস্তানে বন্যা এবং Cycolone বাংলাদেশে সিডর, ভারতে বন্যা, যুক্তরাজ্যে,

জার্মানিতেও। জাপানে ভূমিকম্প, আমেরিকায় সামুদ্রিক ঝড়, চীনে ঝড়, উত্তর কোরিয়ায় অতিবৃষ্টি এবং প্লাবন, পেরুতে ভূমিকম্প, অষ্ট্রেলিয়ার ঝড়, বুরকিনা ফাসোতে অতিবৃষ্টি ইত্যাদি। এ শুধুমাত্র সামান্য একটি তালিকা সব শেষ করা যাবে না।

এসব ঘটনাপ্রবাহ আমাদেরকে সতর্ক করছে। এক প্রতিশ্রুত ব্যক্তির আগমনের সুসংবাদ দিচ্ছে। আল্লাহ্‌র তকদীর কার্যকর, আর মানুষের জন্য এসব হলো সতর্ক সংকেত। তোমরা তোমাদের এক-অদ্বিতীয় খোদাকে অনুসন্ধান কর আর সীমালংঘন করো না, নবী-রসূল ও খোদার বিরুদ্ধে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করো না। যখন এরা সীমালংঘন করে ফেলে তখন আল্লাহ্‌র শাস্তির যাঁতাকল ঘুরতে আরম্ভ করে। অতএব এ সকল আযাব থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। আমাদের ভেবে দেখা দরকার, কোনভাবে কি খোদার নির্দেশ অমান্য করছি? প্রাশ্চাত্যের অধিবাসী, প্রাচ্যে বসবাসকারী এবং সব ধর্মের অনুসারী সবারই এ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। ভালভাবে চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ্‌র ক্রোধ আজ কেন সক্রিয়? একজন আহ্বানকারীর ঐশী আহ্বানের প্রতি মনোযোগ দিন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "আমার আবির্ভাব না ঘটলে এসব বিপদের আগমনের কিছুটা বিলম্ব ঘটতো কিন্তু আমার আগমনের মাধ্যমে খোদা তা'লার ক্রোধ প্রকাশের সেই সুপ্ত পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে যা দীর্ঘকাল অ-প্রকাশিত ছিলো" [রূহানী খাযায়েন ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৮)।

তাই এসব দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে আগমনকারীর আহ্বানে মুসলমানদেরও মনোনিবেশ করতে হবে, খৃষ্টানদেরও করতে হবে আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মনোযোগ দিতে হবে আর ধর্মহীনদের গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে হবে। তাহলেই কেবল খোদা তা'লার ক্রোধভাজন থেকে বাঁচতে পারবো। হে আল্লাহ্! আমাদের সবাইকে তোমার ক্রোধভাজন থেকে রক্ষা করো, আমীন।

নামাযই প্রকৃত ইবাদত

আবু সালেহ্ আহমদ, ঢাকা

'নামায' ফারসী শব্দ। এর আরবী 'সালাত' যার বাংলা বলা হয় দোয়া। নামায বা সালাত আদায় করা প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক ও বুদ্ধিমান মুসলমানের জন্য ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। নামায এক প্রকার নেয়ামত। এটা এমন এক নেয়ামত যার মধ্যে রয়েছে অশেষ রহমত ও কল্যাণ। আল্লাহ্ তা'লার সাথে মানুষের অভ্যন্তরীণ বহির্প্রকাশের নাম ইবাদত। আর নামায এর মধ্যে অন্যতম। নামায আদায়ের নির্দেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন ঃ

"তোমরা নামায কায়েম কর।" নামাযই হল প্রকৃত ইবাদত। কারণ নামাযের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করতে পারি। আঁ হযরত (সা.) নামাযকে মু'মিনের উন্নতির মেরাজ সমতুল্য করেছেন। তিনি বলেন ঃ "নামায মু'মিনের মেরাজ স্বরূপ"। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মানুষের দেহ মন ঘিরে রেখেছে। অতএব পরিপূর্ণ ইবাদত তাই, যা দেহ মন ও আত্মাকে সমভাবে অংশগ্রহণ করায়।

নামায আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতীক। যার মাধ্যমে মানুষ দিনে পাঁচবার আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তাঁর সামনে মাথা নত করে। আল্লাহ্‌র নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হল নামায। নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র নিকট বান্দার চরম আনুগত্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। নামাযকে কুরআন করীমে এত গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা বার বার নামায কায়েম করার কথা বলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মহান এবং অধিক ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর একবার বলাতেই কি না হতে পারে। কিন্তু তিনি শুধু মানুষের জন্যই। তার বান্দার বোঝার স্বার্থে কুরআনে ৮২ বার নামায কায়েমের কথা উল্লেখ করেছেন। নিজে নামাযের কিছু দিক তুলে ধরা হলঃ

দ্বিতীয় স্তম্ভ নামায ঃ নামায ইসলামের ৫ টি স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয়। কলেমা, মুখে বলে অন্তরে পুরাপুরি বিশ্বাস করা, তা সকল মুসলমানদের জন্য মূল অংশ। রোযা সাবালক হবার পরে ফরজ হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে যেমন, অসুখ থাকলে বা সফরে থাকলে এমন সময় রোযা না রাখার বিধান আছে। আর হজ্জ, যাকাত বা সম্পদের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এর চেয়ে এত গুরুত্ব যে তা কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা চলবে না। এতে কোন অজুহাত দেয়াও চলবে না। দাঁড়িয়ে না পারলে বসে, বসে না পারলে শুয়ে হলেও নামায আদায় করতেই হবে। কালেমা পড়ে মুসলমান হবার পরেই সর্বপ্রথম নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র কাছে মাথা নত করতে হবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।

মহানবী (সা.) এর নামায ঃ

নামায বা সালাত আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে সবার ওপর ফরজ করা হয়েছে। আমরা যদি তাঁর চারিত্রিক জীবনের দিকে তাকাই তাহলেই বুঝতে পারব যে, তিনি (সা.) কিভাবে নামায আদায় করেছেন একং নামায সম্পর্কে কি বলেছেন। "একদা নবীজী সাহাবীদের বললেন, যদি কারও বাড়ির পাশ দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হয়, আর যদি প্রতিদিন কোন ব্যক্তি ঐ নদীতে ৫ বার গোসল করে তবে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবারা উত্তর দিলেন, না হে আল্লাহ্‌র রসূল! তখন (সা.) বললেন পাঁচওয়াক্ত সালাতও ঠিক তেমনি তার গুনাহ্ সমূহ দূর করে দেয় (মুসলিম)। তিনি (সা.) এমনভাবে নামায আদায় করতেন যে, দৈনিক নামায পড়ার পরেও তাঁর রাতের বেলায় তিনি আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি এতটাই ইবাদত করতেন যে, একবার তাঁর ইবাদত সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-কে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি তো আল্লাহ্‌কে পেয়েছেন। তাহলে আর কি দরকার আছে নিজের প্রাণের ওপর কষ্ট দেয়া। জবাবে তিনি বলেছিলেন, হে আয়েশা! আমার কি উচিত নয়, যে তাঁর ভালোবাসার জন্য তাঁর শুকরগুজার করা। একথা সত্য যে, আমি আল্লাহ্‌র নৈকট্য পেয়েছি। কিন্তু আমার উচিত নয় কি? আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। কেননা কৃতজ্ঞতা তো কৃপার পরিবর্তেই জ্ঞাপন করা হয় (বুখারী)।

তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করেও নামাযে কোন অবহেলা করেন নি। তিনি যদি আল্লাহ্‌র নৈকট্য পেয়েও এমন করে নামায আদায় করতে পারেন, আল্লাহ্‌র ইবাদতে মসগুল থাকতে

পারেন। তাহলে মু'মিনদেরও চেষ্টা করা উচিত তাঁর (সা.) এর দেখানো রাস্তা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের।

ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ও তাঁর খলীফাদের আলোকে নামায ঃ

ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ছোট বেলা থেকেই আল্লাহ্‌র ইবাদতে মসগুল থাকতেন। সর্বক্ষণ মসজিদে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন। ছোট বেলায় তিনি তাঁর এক সহপাঠিকে বলেছিলেন যে, "সে যেন তাঁর জন্য দোয়া করে। যেন তিনি নামায আদায় করতে পারেন।" তিনি (আ.) তাঁর জীবনে এমন ভাবে নামায আদায় করেছেন এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতে এত মসুগুল ছিলেন যে, তা তাঁকে শেষ যুগের এই মহান হবার সৌভাগ্য দিয়েছে। তিনি (আ.) তাঁর হাকীকাতুল ওহী পুস্তকে লিখেছেন, নামায আদায় করার ক্ষেত্রে মানবীয় প্রচেষ্টার চেয়ে অধিক কি করতে পারে যে, যতদূর সম্ভব পাক-পবিত্র ও বিপদমুক্ত হয়ে নামায আদায় করবে, নামায যেন পতিত অবস্থায় না থাকে সেই চেষ্টা করবে এবং এর সব অংশই আবেগের সাথে আদায় করবে। ...খোদার দরবারে উপস্থিত হওয়ার মত অবস্থায় নামাযে বৃষ্টি করে ফেলবে যে, খোদাকে যেন সে দেখছে। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নামাযে এ অবস্থা যতক্ষণ সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষতি হতে মুক্ত নয়। তিনি (আ.) আরো বলেন, "মহানবী (সা.) যখনই কোন দুঃখ-কষ্ট বা বিপদের সম্মুক্ষীন হতেন তখনই তিনি নামায পড়তে দাঁড়িয়ে যেতেন। যে সমস্ত সত্যান্বেষী ব্যক্তি গত হয়েছেন সবার অভিমত এটাই যে, নামায ব্যতীত খোদার নৈকট্য অর্জনের অন্য কোন পথ নেই। (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১০)।

হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রা.) বলেছেন ঃ

আমি যখন বলি নিষ্ঠার সাথে নামায আদায় করা হোক। তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তোমরা ৫ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে অন্তত ৪ ওয়াক্ত পড় বা সপ্তাহে ৩৫ ওয়াক্তের মধ্যে অন্তত ৩৪ ওয়াক্ত পড়, বা বছরে ১৮০০ ওয়াক্তের ***মধ্যে*** অন্তত ১৭৯৯ ওয়াক্ত নামাযই পড়। বরং আমি নিয়ম-নিষ্ঠার সাথে নামায আদায় করতে বলি। তার উদ্দেশ্য আমাদের বছরের ১৮০০ ওয়াক্তের সব ওয়াক্ত নামায নিয়মিত ভাবে আদায় করতে হবে (মাশআলে রাহ্‌)।

বা-জামাত নামাযের গুরুত্ব ঃ

নামায শুধু আদায় করলেই হবে না। একে জামা'তের সাথে আদায় করা আবশ্যক। কুরআনে আল্লাহ্‌ তা'লা বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। একাকী নামাযের কথা বলেননি। তাই নবী করীম (সা.) বলেছেন একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তির চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াবের অধিকারী হবে জামাতের সাথে নামায আদায় করলে।

একবারের ঘটনা, যেদিন হযরত উমর (রা.) আহত হয়েছিলেন ঐ দিবাগত রাত্রে লোকেরা ফজরের নামাযের জন্য বেদারী করছিল আর বলছিল, যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করে ইসলামে তার কোন ঠাঁই নাই। তাঁর (রা.) এতটাই আহত হয়েছিলেন যে, তখনও রক্ত পড়ছিল। ঐ কথা শুনে তিনি তখন ঐ অবস্থাতেই নামায পড়লেন (বুখারী)।

আমাদের প্রথম খলীফা হযরত আলহাজ্জ হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) যখন মদীনায় ছিলেন তখন একদিন যোহরের নামায বাজামাত আদায় করতে পারেন নি। ফলে তিনি এতটাই কষ্ট পান এবং নিজের মধ্যে অনুশোচনা হয়, তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি কবীরা গুনাহ করে ফেলেছেন, আর এর কোন ক্ষমা নেই।

নামায বেড়া স্বরূপ ঃ

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায মু'মিনদের জন্য বেড়া স্বরূপ। যেমন কোন শত্রুর পোক্ত-বেড়া কেউ অতিক্রম করতে পারে না। অনুরূপ নামাযকে মু'মিন ছাড়তে পারে না এবং নামাযকে পিছনে ফেলে অন্য কাজ হাতে নিতে পারে না। আগে মক্কায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে পাঁচ বার মদ্যপান করা হত। ইসলাম আসার পরে তা পরিবর্তন করে ৫ ওয়াক্ত নামায প্রতিষ্ঠা করা হয়। একজন নামাযী যদি নিষ্ঠার সাথে ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তা হলে সে কখনই খারাপ কাজ করতে পারে না। কারণ আল্লাহ্‌ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, "নিশ্চয় নামায (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে" অতএব নামাযই হল সেই আধ্যাত্মিক বেড়াজাল যা কোন পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী নামাযী ছিড়তে পারে না।

আল্লাহ্‌ প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেন ঃ

অর্থঃ সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমরা আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না (২ঃ১৫০) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা অর্থাৎ তাঁকে ভয়, ভক্তি ও ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা এবং তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। পূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রার্থনার প্রথম ধাপ হল নামায। যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'লাকে বেশি কাছে পাওয়া যায়। এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'লা বলেছেন তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অর্থাৎ এখানে নামায আদায়ের কথাই বলা হচ্ছে যে, তা ধৈর্য ও আদবের সাথে আদায় করতে হবে। সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আমাদের নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌কে ডাকতে হবে। তা হলেই আল্লাহ্‌ আমাদের ডাকে সারা দিবে।

পরিশেষে এই বলে শেষ করতে চাই যে, মহান আল্লাহ্‌ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, 'অতএব দুর্ভোগ এমন সব নামাযীদের জন্য যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন। (১০৭ঃ৫-৬)

আমরা আহমদী মুসলমান। আমরা সবার থেকে আলাদা ভাবে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য। তাই বলে আমরা যদি সঠিক ভাবে নিয়মিত আল্লাহ্‌র ইবাদত না করি তাহলে আমরা আমাদের এই মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে হারিয়ে ফেলব। আহমদীয়াত হচ্ছে খাঁটি ইসলামের উত্তম পথ। যেখানে আনুগত্যের সাথে থাকলে আল্লাহ্‌ অনেক কাছে চলে আসেন। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ "যদি দশ দিনও নামাযকে নিষ্ঠার সাথে আদায় করা হয় তবে হৃদয় আলোকিত হয়ে যায়। স্মরণ রাখ প্রথা এক জিনিস আর নামায অন্য জিনিস। নামায এমন জিনিস খোদার নৈকট্য অর্জনের জন্য যার চেয়ে নিকটতম মাধ্যম আর নেই।"

যারা নামায আদায় করে না তাদের হৃদয়ে আলো নেই। তারা আত্মাহীন দেহের মত। এ ইবাদতকে যারা অবহেলা করে তারা কখনও আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পেতে পারে না। কারণ এই প্রার্থনার মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। নামাযের পুরো অংশই হচ্ছে দোয়া। যার কারণে আল্লাহ্‌ দোয়াকারীর দোয়া শুনেন এবং তার উত্তর দেন। কেউ যদি এ ইবাদত অর্থাৎ নামায ঠিক ভাবে আদায় করে তাহলে তাদের পার্থিব ও পরকালীন জীবন ভালো হবে। আমরা বে-নামাযীদের মত হব কেন? আমরা আহমদীয়াতের ছায়াতলে থেকে খাঁটি ইসলামের স্বাদ গ্রহণ করব এবং নিয়মিত নামায আদায় করব এবং তা কায়েম করার চেষ্টা চালিয়ে যাব। যেখানে আল্লাহ্‌ ৮২ বার নামায কায়েমের কথা বলতে পারেন, সেখানে আমাদের এক দুইবার হতাশ হলে চলবে না। লেগে থাকতে হবে এবং প্রকৃত নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

আল্লাহ্‌ আমাদের সবাইকে বেশি করে ধৈর্য ধরে নামায আদায়ের তৌফিক দান করুন, আমীন।

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
"পবিত্র রমযানে আমাদের করণীয়"
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

রোযার বরকতে আমাদের সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত করুন

পবিত্র মাস সমূহের মধ্যে অন্যতম মাস হল পবিত্র রমযানুল মোবারক। অতএব এ মাসে আমাদের কর্তব্য হল আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও পবিত্র রসূল (সা.)-এর আদর্শে যাবতীয় শর্ত সুচারুরূপে পূর্ণ করে রোযা রাখা। পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের ওপরও রোযার আদেশ ছিল। হিন্দুরা উপবাসব্রত পালন করে থাকেন। তবে ইসলামী ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ ভাবে যাবতীয় বিষয়াবলী যা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত তা পূর্ণ করে রোযা পালন করা হয়ে থাকে। রোযার জন্য নিয়ত করতে হয় আর এ নিয়ত ভোর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অভুক্ত থাকার জন্য নয়। শুধু শারীরিক সম্পর্ক ও পানাহার মুক্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য পূরণে সব নয়। সারাদিন ব্যাপী ইসলামী আদর্শ তথা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সুন্নত মোতাবেক প্রতিটি মুহূর্ত আমাদেরকে পূর্ণ করে অতিবাহিত ও বাস্তবায়িত করাই রোযার উদ্দেশ্য। সাবালক নর হোক বা নারী প্রত্যেকের রোযা থাকা ফরজ। আদর্শ আমাদের যতই উত্তম হোক বাস্তবতা যাদি তার পরিপূরক না হয় তবে তা নিতান্তই বঞ্চনা বই কিছুই নয়।

> সাবালক নর হোক বা নারী প্রত্যেকের রোযা থাকা ফরজ। আদর্শ আমাদের যতই উত্তম হোক বাস্তবতা যাদি তার পরিপূরক না হয় তবে তা নিতান্তই বঞ্চনা বই কিছুই নয়।

তাই প্রথম কথা হল আমরা সবাই যেন বিনা ব্যতিক্রমে রোযা থাকি। আমরা বুঝতে পারি ইসলামী পদ্ধতি কত মহান এবং কত সুদূর প্রসারী এর ব্যপ্তি। রোযার মাসে শেষ দশ দিন মসজিদে এতেকাফ করা রসূল (সা.)-এর সুন্নত। গরীব-মিসকিন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে আর্থিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ামতে সম্পৃক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। রমযান মাসে পবিত্র রসূল (সা.) ঝড়ের বেগে দান খয়রাত করতেন। রোযার মাসে জিব্রাঈল (আ.) হুযূর (সা.)-কে দুইবার পবিত্র কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। আমাদের সম্ভব হলে তারাবীতে পবিত্র কুরআন এক খতম করা দরকার। ব্যক্তিগত ভাবেও যে যতটুকু পারেন প্রত্যহ কুরআন তেলাওয়াত করা এবং কমপক্ষে একবার সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ সম্পন্ন করা উচিত যেহেতু আমাদের যাবতীয় চাঁদা ইসলাম ও ইসলামের উন্নতিকল্পে ব্যয় হয় সেহেতু এ পবিত্র মাসে আমাদের যাবতীয় চাঁদা পরিশোধ, যাকাত প্রদান, ফিদিয়া, ঈদফান্ডে দান ও অন্যান্য খাতে আদায়কৃত সমুদয় চাঁদাই পরিশোধ করে দেয়া দরকার।

সম্ভব হলে জামাতী ভাবে অন্যথায় ব্যক্তিগত ভাবে অতি অবশ্যই তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য পবিত্র রমযানুল মোবারক এক বিশেষ সময় এছাড়া জামাতিভাবে ইফতারের ব্যবস্থা এবং তারাবী নামায পড়া জরুরী। আল্লাহ্ পাক এমন করুন যেন একজন আহমদীও এ পবিত্র মাসে রোযা পালন থেকে বাকি না থাকেন এবং আমরা যেন যাবতীয় শর্ত শতভাগ পূরণ করে রোযা পালনের সৌভাগ্য অর্জনকারী হই।

রমযানের শেষ দশকে যে শবে কদর আসে তা থেকে যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বঞ্চিত না রাখেন। আমরা অধম আমাদের সব দুর্বলতা আল্লাহ্ পাক তাঁর অসীম কৃপায় ঢেকে দিন এবং রোযার বরকতে আমাদের সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন, আমীন।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

পবিত্র রমযানে আমাদের করণীয়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে পারো" (২ঃ১৮৪)।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে রোযা বা উপবাস-ব্রত পালন সকল ধর্মেই কোনো না কোন আকারে পাওয়া যায়। খোদা তা'লার মনোনীত প্রিয় ধর্ম ইসলামে যে পাঁচটি মূলস্তম্ভ আছে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাহে রমযানের "রোযা" পালন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি বিশ্বাসের আন্তরিকতার ও উত্তম ফল লাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বের সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে।" অপর দিকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, "রমযান হলো সেই পবিত্র মাস, যার মধ্যে কুরআন করীম অবতীর্ণ হয়েছে। সুফীগণ লিখেছেন, এ মাসে আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। এ মাসে বহুল পরিমাণে কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) লাভ হয়ে থাকে।"

মু'মিন বান্দাগণ সারা বছরই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন এই পবিত্র মাসের জন্য। রমযানের আগমনে মু'মিনগণের আধ্যাত্মিক বাগানে ঘটে নব-বসন্তের সমারোহ! বয়ে আনে ইবাদত-বন্দেগীর বাড়তি সুযোগ, যা কাজে লাগিয়ে তাঁরা অন্বেষণ করেন আল্লাহ্‌র নৈকট্য। প্রিয় রসূল (সা.) রোযার-মাহত্ম বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, "প্রত্যেক জিনিষের জন্য যেমন নির্দিষ্ট দরজা থাকে তেমন ইবাদতের দরজা হলো, 'রাযা'

আর রোযাদারের জন্য দরজা হলো 'রাইয়ান'। রোযা ঢালস্বরূপ দোযাখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার নিরাপদ-দূর্গ। পবিত্র রমযান আমাদেরকে শেখায় দৃঢ়মনোবলের সাথে রোযা রাখা, ফরজ ইবাদত ছাড়াও রাত জেগে নফল ইবাদত করতে, বিনীতভাবে দোয়া করতে, অধিক হারে পাক কুরআন তেলাওয়াত করতে, দান খয়রাত করতে ঝড়ের বেগে, আর সকল কু-প্রবৃত্তির কু-প্ররোচনা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করার শিক্ষা দেয়। কেবলমাত্র অনাহারে থাকা শেখায় না বরং অধিক হারে যিক্‌রে ইলাহী যা আত্মাকে সতেজ রাখে।

আমরা রসূল করীম (সা.)-এর উম্মত। তাঁর প্রকৃত অনুসারী। তাই আমাদের উচিৎ হবে তাঁর (সা.) পদাঙ্ক অনুসরণে এই পবিত্র মাসে এই রাস্তায় এগিয়ে যাওয়া। এই পবিত্র মাসে বেশি বেশি কুরআন পড়া, অপরকে শিখানো, শুনা ও শুনানোর বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নামায, দান খয়রাত, কুরআন পাঠ, রোযা পালন ও নেক আমলের সমন্বয়ে নিজেদের মাঝে এক অভিনব পরিবর্তন সাধন করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে তাঁর প্রিয়ভাজন হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি। রমযান পশু-প্রবৃত্তগুলোকে দমন করার শিক্ষার সাথে ঈমানী-শক্তিকে বলীয়ান করার এবং সংযমী মনোভাব গড়ার অতুলনীয় শিক্ষা দেয়। তাক্‌ওয়া-ভিত্তিক সমাজ গঠনের পাশাপাশি রূহানীয়ৎ লাভের পূর্ণ সুযোগ এনে দেয়। প্রতি বছর রমযানের পুনরাগমনে বান্দার ঘাটতি পূণ্যকর্মগুলি পূরণের অপূর্ব সুযোগ পেয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের বাড়তি সুযোগ পায় তাছাড়া বা-জামাত নামাযে শামেল হয়ে মু'মিন ২৭ গুণ বেশী পুণ্য অর্জনের ভাগীদার হতে পারেন। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মরা যদি বড়দের অনুকরণ করে এ সকল ধর্মীয় রীতি-নীতিগুলি পালনের মধ্য দিয়ে অভ্যস্ত হতে পারে তাহলে ইসলাম তথা আহমদীয়াতের মূল-শিক্ষা সার্থক হবে, ইনশাআল্লাহ্‌! যাবতীয় ধর্মীয় রীতি-নীতিগুলি মানার মধ্যে খোদার প্রতি ইতায়াত ও পূর্ণ আনুগত্যের শিক্ষা নিহিত। রোযার তিন ভাগ যথা রহমত, মাগফিরাত ও নাযাত-এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করা এবং নাযাতের অংশের একটি অত্যন্ত-মর্যাদাপূর্ণ রাত "লায়লাতুল কদর" যা মু'মিনের অধিক হারে তওবা ও ইস্তেগফার করার অতুলনীয় সুযোগ এনে দিয়েছে। আসলে দয়াময় খোদা এমন পবিত্র মাসে আমাদেরকে নিয়তের ওপর দৃঢ় আমলকারী হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ সকল স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকবে এটাও রমযানের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। পাক কুরআন থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, অসুস্থ ও সফরকারী এবং নাবালক এদের জন্য রোযা রাখা সঙ্গত নয়। এ আদেশ মহান আল্লাহ্‌রই অসুস্থ ও সফরকারীর রোযা অন্য সময়ে পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে তারা ইবাদত বন্দেগী ও কুরআন তেলাওয়াত অবশ্যই করতে পারবে। পবিত্র রমযান আমাদেরকে প্রকৃত-পরিবর্তনকারী বান্দায় পরিণত করুন, আমীন।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

"লায়লাতুল কদর" যা মু'মিনের অধিক হারে তওবা ও ইস্তেগফার করার অতুলনীয় সুযোগ এনে দিয়েছে। আসলে দয়াময় খোদা এমন পবিত্র মাসে আমাদেরকে নিয়তের ওপর দৃঢ় আমলকারী হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন।

রোযা জান্নাতের পথে নিয়ে যায়

আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ কৃপায় আবার আমরা পবিত্র মাহে রমযান লাভে সৌভাগ্য পাচ্ছি। আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে রমযানের দিনগুলো বিশেষ ইবাদত বন্দেগীর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন। রমযান হল সেই মাস যাতে নাজিল হয়েছে পবিত্র কুরআন। আল কুরআনের আগমন গোটা মানবজাতির নিরাপদ ও সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য। সঠিক পথ পাওয়ার জন্য যাবতীয় উপায়-উপকরণ, প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলীর সমাহার রয়েছে এই কিতাবে এবং এটি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। এ ছাড়া আল্লাহ্‌র হক, বান্দার হক, কোনটা সঠিক, কোনটা বাতিল এভাবে সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার যাবতীয় উপকরণ এতে রয়েছে। সর্বোপরি মানবজাতিকে সত্যের পথে চলার নির্দেশনা এ গ্রন্থে বহুবার উল্লেখ হয়েছে। রমযানের রোযা রাখাকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এই পবিত্র কুরআনে ফরজ করেছেন।

রমযানের রোযা মানুষকে মুত্তাকি হওয়ার পথ দেখায়। ইসলামের পরিভাষায় সাবালকত্ব হওয়ার পর থেকে আমৃত্যু যদি কেউ কঠিন কোন ব্যাধি বা শরিয়তসম্মত নিষেধাজ্ঞার আওতায় না আসে, তাহলে সে আমৃত্যু এ মাসের রোযা পালন করবে। রোযা মানুষকে সংযমী, ধৈর্যশীল, সব ধরনের লোভ-লালসার উর্ধ্বে রাখাসহ তার আচার-আচরণ ও কথাবার্তার মাধ্যমে অন্য কেউ যাতে আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার শিক্ষা দেয়। এছাড়া রোজা আমীর-ফকির, রাজা-প্রজার মধ্যে ভেদাভেদ ছিন্ন করে সবাইকে এক কাতারে শামিল করে। এই তাকওয়া অর্জনের পুরস্কার আল্লাহ নিজ হাতে প্রদানের ঘোষণাও দিয়েছেন। আর তার পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত লাভের সাফল্য। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হতে পারে?

রমযানে যদি কেউ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন নফল ইবাদত বা দান-খয়রাত করে তাহলে সে এক-একটির জন্য সত্তরটি নেকি অর্জন করবে এবং তার এ নফল ইবাদত ফরজ ইবাদতের সমতুল্য হবে। তাই এ সুযোগ যাতে কোনভাবে হাতছাড়া না হয়, এজন্য আমাদেরকে সাধ্যমতো চেষ্টা করা উচিত। সর্বোপরি, রমযানের প্রথম ১০ দিন হচ্ছে রহমতের, দ্বিতীয় ১০ দিন মাগফিরাতের এবং শেষ অংশ দোজখের আগুন থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে রমযানের বাকী দিনগুলো বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগীতে রত থেকে কাটানোর তৌফিক দান করুন, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী
তেজগাঁও, ঢাকা

'পাক্ষিক আহমদী' পত্রিকার গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্য, গ্রাহক চাঁদার হিসাব এবং নতুন গ্রাহক হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে যোগাযোগ করুন :

মোবাইল : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"ঈদ হোক ইবাদত"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ৩০ জুন, ২০১৫-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী আরো দুই সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। পবিত্রতা রক্ষায় বিয়ের গুরুত্ব।

২। ইসলামে হজ্জের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বি: দ্র: পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-
সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আতফাল দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২২শে মে ২০১৫ তারিখ রোজ শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে আতফাল দিবস সফলতার সাথে পালিত হয়। বাজামাত তাহাজ্জদ নামাযের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। ৬৮জন তাহাজ্জদ নামাজে অংশ নেন। সকাল ৬.৫৫মি.-এ সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব শরিফ আহমদ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও আহাদ পাঠের পর উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম আমীর,

ব্রাহ্মণবাড়িয়া। মঞ্চে অতিথি বৃন্দের মধ্যে ছিলেন- রিজিওনাল প্রতিনিধি, জেলা কায়েদ, স্থানীয় কায়েদ, মুরব্বী এবং মোয়াল্লেমীন। সকাল ৮.০০টায় প্রতিযোগিতা পর্ব আরম্ভ হয়। ফুটবল, কুইজ, পয়গামে রেসানীসহ মোট ৩টি দলগত খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৩.০০ঘটিকায় সদর সাহেবের প্রতিনিধির সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরষ্কার বিতরণী আরম্ভ হয়। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, জনাব শেখ সাব্বির আহমদ-জেলা কায়েদ, জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ-স্থানীয় কায়েদ, জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন-আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং মৌ. আবু তাহের। এতে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পেশ করেন যথাক্রমে জনাব ইশতিয়াক আহমদ অলড্রিন ও জনাব তাইয়্যেফ মাহমুদ অনন্ত। এরপর সভাপতির সমাপনী ভাষণের পর বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকারীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এ বৎসর আতফাল দিবসে শিশুসহ সর্বমোট ১২০জন আতফাল অংশগ্রহণ করেন।

আকবর আহমদ সোহাগ

রংপুর রিজিওনাল মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ১১তম বার্ষিক কর্মশালা ও যয়ীম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ রংপুর রিজিওনের ১১তম বার্ষিক কর্মশালা ও যয়ীম সম্মেলন গত মে/১৫ তারিখে সৈয়দপুর মসজিদে অত্যন্ত সুন্দর ও সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। নায়েব সদর জনাব নঈম আলম খান ও কায়েদ মাল, জনাব আব্দুর রশীদ উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্র থেকে যোগদান করেন। এতদঞ্চলের ১৬টি মজলিস থেকে ১৪ জন যয়ীম, ১ জন প্রতিনিধি, ১৩ জন স্থানীয় কর্মকর্তা বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরের জেলা নাযেমদ্বয় সম্মেলনে যোগদান করেন। নায়েব সদর-এর সভাপতিত্বে সকাল সাড়ে দশটায় কর্মশালা ও সম্মেলনের ১ম অধিবেশ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। সভাপতির দোয়া ও আহাদ পাঠ পরিচালনার পর মূল্যবান উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। এরপরে বৃহত্তর রংপুরের ৮ জন যয়ীম তাদের মজলিসের রিপোর্ট এবং কাজের আগাম পরিকল্পনা তুলে ধরেন। বেলা ৩ টায় নায়েব সদর-এর সভাপতিত্বে ২য় ও সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। প্রথমে বৃহত্তর দিনাজপুরের ৬ জন যয়ীম ও ১ জন প্রতিনিধি তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। এরপর জেলা নাযেমদ্বয় তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। রিজিওনাল নাযেম হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম। এরপর জনাব আব্দুর রশীদ মজলিসের অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ এবং করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর সভার সভাপতি ও নায়েব সদর জনাব নঈম আলম খাঁন সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন এবং আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মশালা ও সম্মেলনের সফল সমাপ্তি হয়।

খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম

সোহাগী জামা'তে তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৮-২০ মে, ২০১৫ পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সোহাগীতে তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সহী কুরআন পাঠ, হাদীস, অর্থসহ নামায, এতায়াতে নেযাম ও ধর্মীয় জ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নেয়া হয়। শিক্ষক হিসাবে ক্লাসগুলি পরিচালনা করেন জনাব আব্দুর রহমান ফকির, মৌ. ফরহাদ আলী এবং মৌ. মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জনাব ডাঃ আব্দুল হান্নান, প্রেসিডেন্ট সোহাগী জামা'ত। আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, নাসেরাত ও আতফালসহ প্রতিদিন গড়ে ২৭ জন সদস্য/সদস্যা উক্ত ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন। ২০ মে বাদ যোহর সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে ৭ জন জেরে তবলীগ মেহমানও উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ৪ জন মেহমান বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখিল হন, আলহামদুলিল্লাহ্। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি হয়।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার নওমোবাঈন সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০৫/২০১৫ তারিখ সকাল ১০টা হতে বেলা ১টা পর্যন্ত স্থানীয় প্রথম বার্ষিক নওমোবাঈন সেমিনার লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে পালন করা হয়। নওমোবাঈন সেমিনারে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নওমোবাঈন বোন পারভীন বেগম। নযম পেশ করেন তাহেরা মাজেদ রাফা। দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা খুরশেদ আলম।

এরপর নওমোবাইনদের তালিম তরবিয়তের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখা হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠান শেষে ১ জন বোন বয়আত গ্রহণ করেন। এতে ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

আঞ্জুমানারা রাজ্জাক

বিজ্ঞপ্তি

স্বল্পমেয়াদে আহমদী স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর পুরাতন প্রকাশনা ও পাক্ষিক আহমদী সমূহের স্ক্যানিং-এর মধ্য দিয়ে ডিজিটাল মাধ্যমে স্থানান্তরের কাজ চলছে। এই কাজে সহযোগিতার জন্য স্বল্পমেয়াদে আহমদী স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন। আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকগণকে ন্যূনতম এসএসসি পাশ হতে হবে। আগ্রহীদেরকে এই কর্মসূচীর আওতায় স্বল্পমেয়াদে স্ক্যানিং অপারেটর হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। এটি নিয়মিত অথবা স্থায়ী চাকুরীর অংশ হবে না। তবে আগ্রহীদেরকে বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং বকশীবাজারে তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। দূর হতে আগতদের জন্য ন্যূনতম দিবস কাজের প্রেক্ষিতে যাতায়াত ভাতাও দেয়া যেতে পারে। সফলভাবে কাজ শেষে আগ্রহীদেরকে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্যও সহযোগিতা করা হবে, যা তার ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানে সহায়ক হবে। সকল আগ্রহীদেরকে সরাসরি নিম্নের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জামাল উদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী তালিম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
মোবাইল নং- ০১৭১২২৪০৪১২

বিজ্ঞপ্তি

কাদিয়ান সফর প্রসঙ্গ

মোকাররম ওয়াকিলুল তামিল ও তানফীয সাহেব লন্ডন এর পত্র মোতাবেক ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশক্রমে জানাচ্ছি যে, যে সকল আহমদী সদস্য বিভিন্ন সময়ে কাদিয়ান সফর করতে যান তাদেরকে অবশ্যই বাংলাদেশ জামা'ত হতে প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী কাদিয়ান সফরে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে সফরের কমপক্ষে একমাস পূর্বে স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সুপারিশকৃত আবেদনপত্র ও পাসপোর্টের ১ম ৫ পাতার ফটোকপিসহ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট আবেদন করতে হবে। উত্তমরূপে আবেদন পাওয়ার পর বাংলাদেশ জামা'ত আবেদনকারীর নামে প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত করে তা লন্ডনে পাঠাবে। লন্ডন হতে উক্ত প্রত্যয়নপত্র কাদিয়ান পৌঁছানোর পরেই আবেদনকারী কাদিয়ান সফর করতে পারবেন। এখন হতে এরূপ প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত কোন ব্যক্তি কাদিয়ান গিয়ে কোন সমস্যায় পড়লে তার জন্য বাংলাদেশ জামা'ত দায়ী থাকবে না। ভারত সফরের নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনার কারণে কাদিয়ান জামা'তের কর্তৃপক্ষ উত্তমরূপে প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে কাদিয়ানে থাকার অনুমতি দিতে পারছেন না। নিয়ম বহিঃর্ভূতভাবে কাদিয়ান গিয়ে কেউ যেন বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখী না হন এবং বাংলাদেশ জামা'তকেও বিব্রত না করেন এ জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

মোহাম্মদ আবদুস সামাদ
সেক্রেটারী উমুরে আমা
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইসলামগঞ্জ-এর প্রেসিডেন্ট জনাব ডাঃ রুহুল আমীন গত ২০/০৫/২০১৫ দুপুর ১২-১৫ মিনিটে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি ২ ছেলে, ১ মেয়ে ও ২ নাতনীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুম ১৯৮৫ সনে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা বুঝতে পেরে আহমদীয়া জামা'তে বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আতের পর অনেক বিরোধিতা হয়েছে, এমনকি দীর্ঘদিন তার জমি-জায়গায় চাষাবাদ করতে দেয়নি এবং হাট-বাজার করাও বন্ধ করে দিয়েছিল। তিনি ইসলাম গঞ্জের নওগাঁ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ইয়াকুবুল্লাহ পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি ছিলেন। তার নিজ বাড়ীতে তিনি বাজামাত নামাযের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া মসজিদ নির্মাণের জন্য তিনি ১১শতক জমি জামা'তকে দান করেছেন।

তিনি তবলীগ পাগল ছিলেন, যেখানেই যেতেন তবলীগ করতেন, তার তবলীগে বেশ অনেক মানুষ সত্যের সন্ধান লাভ করেন। মরহুমসহ তার পরিবারের সবাইকে তিনি নেযামে ওসীয়্যতের বরকতময় তাহরীকে শামিল করেন। মরহুমের নামাযে জানাযা বকশী বাজারের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। নামায পড়ান মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। মরহুমের লাশ ইসলামগঞ্জে তারই দান করা কবরস্থানে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে দাফন করা হয়। সেখানেও জানাযা হয় এবং এতে কয়েকজন অআহমদীও অংশ নেন। মরহুম জামা'তের একনিষ্ঠ আনুগত্যশীল ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ দিন ইসলামগঞ্জ জামা'তের প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্ব খুবই আন্তরিকতার সাথে পালন করেন। মরুহম-এর ছোট ছেলে মোহাম্মদ রুহুল বারী জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ থেকে শাহেদ কোর্স সম্পন্ন করে জামা'তের মুরব্বী সিলসিলাহ হিসেবে খেদমত করছেন। মহান আল্লাহ্ তা'লা যাতে মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মাকাম এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সাবরে জামিল দান করেন, সেজন্য সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করছি।

রফিক আহমদ আলমগীর
মরহুমের বড় ছেলে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নন্দনপুর কুমিল্লার সদস্যা ছালেহা বেগম চৌধুরী গত ১৫ই এপ্রিল ২০১৫ইং তারিখে হার্ডের সমস্যা জনিত কারণে কুমিল্লা সদর হাসপাতালে নেয়ার পরপরই রাত ০৯.৩০মি. শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুমার স্বামী মরহুম মৌ. হোসেন আহমদ, মৃত্যুর আগপর্যন্ত মোয়াল্লেম হিসেবে জামা'তের খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি ৭ই এপ্রিল ২০০১ইং সালে ঢাকা জামাতের হালকা নাখালপাড়ায় কর্মরত অবস্থায় ৫৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি তিন মেয়ে, দুই ছেলে ও চার জন নাতি নাতনি রেখে গেছেন। মরহুমা তার দুই ছেলেকেই ওয়াকফে জিন্দেগি হিসেবে জামা'তের খেদমত করার জন্য উৎসর্গ করেছেন (আলহামদুলিল্লাহ্)।

মরহুমার বড় ছেলে নাসের আহমদ ২০১৪ সালে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ থেকে শাহেদ পাশ করে বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আর ছোট ছেলে তাহের আহমদ জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ বর্ষের ছাত্র। জামা'তের প্রতি মরহুমার অগাধ ভালবাসা ছিল। কথা প্রসঙ্গে জামা'ত শব্দটি বলতে হলে সবসময় তিনি আল্লাহ্‌র জামাত বলতেন। তিনি সবসময় মানুষের উপকার সাধনের চেষ্টা করতেন। মৃত্যুর পর তার এলাকাবাসির মধ্যে থেকে অনেকেই বলেছেন, আমরা তার থেকে বিভিন্ন সময়ে উপকৃত হয়েছি, তিনি খুবই নেক মহিলা ছিলেন, বাড়ির সকলের সাথেই তার সুসম্পর্ক ছিল। ১৬ই এপ্রিল দুপুর ১২.৩০মিনিটে তার জানাজার নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নিজ বাড়িতে স্বামীর কবরের বাম পাশে দাফন কার্য সম্পন্ন করা হয়।

আল্লাহ্ তা'লা যেন মরহুমাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন এ জন্য জামা'তের সকলের নিকট বিশেষ দোয়ার আবেদন করছি।

নাসের আহমদ (মুরব্বী সিলসিলাহ্)
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

* শুভ বিবাহ *

* গত ০৫/১২/২০১৪ মোসাম্মাৎ রুবানা আহমদ, পিতা-মরহুম শাহ্ বাহা উদ্দিন, বাসা নং ৬, রোড, নং তছলিম উদ্দিন স্মরণী, মুন্সিপাড়া, রংপুরের সাথে মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম, পিতা-নূর মোহাম্মদ সরকার, গ্রাম: খায়ের হাট, তাহেরাবাদ-এর বিবাহ ২৫০,০০০/- (দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৫৭/১৫

* গত ১৬/০১/২০১৫ মোসাম্মাৎ রোকেয়া বেগম, পিতা-মরহুম আব্দুল মালেক, সুহিলপুর, ঘাটুরার সাথে শেখ কামরুজ্জামান লিটন, পিতা-শেখ মোহাম্মদ ইসহাক মিয়া, দক্ষিণ মৌড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৫৮/১৫

* গত ০৬/০৩/২০১৫ শ্যামলী আক্তার, পিতা-মরহুম আনিছুর রহমান ভূইয়া সাং+পোঃ কোড্ডা, থানা+জেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মোহাম্মদ এজাজ উল হক, পিতা-মরহুম আনোয়ার উল হক, তেস্তরী বাজার, তেজগাঁও-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৫৯/১৫

* গত ০৬/০৩/২০১৫ মুক্তা আক্তার, পিতা-আব্দুর রহমান (রানু), শালসিড়ি, পঞ্চগড়-এর সাথে ইয়ামিন আলী, পিতা-তাইজউদ্দিন মিয়া, শালসিড়ি, পঞ্চগড় এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৬০/১৫

* গত ২২/১২/২০১৪ ইতি আক্তার, পিতা- মাজু মিয়া, গ্রাম+পোঃ তারুয়া, থানা-আশুগঞ্জ, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে কায়েম আহমদ, পিতা-নিজাম মিয়া, গ্রাম+পোঃ ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ১,৬০,০০০/- (একলক্ষ ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৬১/১৫

* গত ০৭/৩/২০১৫ নাজমুন নাহার, পিতা-আবুল ওহাব মুন্সী, টাউন কালীকাকুর, পটুয়াখালী ছোট চৌরাস্তার সাথে মোহাম্মদ মিলন খান, পিতা-মৃত সুলতান খান, গ্রাম-দক্ষিণ ছোপখালী, পোঃ দক্ষিণ ছোপখালী বেতাগী বরগুনার বিবাহ ১,০০০,০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৬২/১৫

* গত ০১/০৫/২০১৪ তানীয়া বেগম, পিতা-বেলাল আহমদ, দুর্গারামপুর-এর সাথে এস এম আমানুল্লাহ্ (লিংকন), পিতা-এস এম ওসমান, ঘাটুরার বিবাহ ২,৯৯০০০১/- (দুইলক্ষ নিরানব্বই হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৬৩/১৫

* গত ১৬/০২/২০১৫ নূর নাহার খাতুন, পিতা-নূর হোসেন সরদার, আবাদচণ্ডিপুর, কদমতলী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে সাহারিয়ার আহমদ (সুজন), পিতা-আবু মহাসিন গাজি, মরাগাং, যতিন্দ্রনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ১০০০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৬৪/১৫

* গত ০৮/১১/২০১৪ জ্যোস্না পারভিন, পিতা-মোহাম্মদ মোহর আলী গাইন, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ফকির, পিতা-মোহাম্মদ নওসের আলী ফকির, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৬৫/১৫

* গত ২৫/০২/২০১৫ পারুল খাতুন, পিতা-হারুন গাজী, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে আব্দুল আলিম, পিতা-আব্দুস সাত্তার, মরাগাং, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৬৬/১৫

* গত ২০/০২/২০১৫ মোছাঃ শারমিন আক্তার, পিতা মোহাম্মদ শামীম আহমদ, গ্রাম-রামপুর, থানা-কাহারোল, জেলা-দিনাজপুর-এর সাথে মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, পিতা-মৃত আহমদ সাফা, নাই খাইন পটিয়া, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (একলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৬৭/১৫

* গত ৩০/০১/২০১৫ সাদিয়া আফরিন ঐশী, পিতা-মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, কোতালের বাগ, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ-এর সাথে আহমদ ইয়ামিন, পিতা-মির্যা আলী, কোতালের বাগ ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ-এর বিবাহ ৮,০০,০০০/- (আটলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৬৮/১৫

* গত ১০/০৭/২০১৪ সুমি আক্তার, পিতা-আব্দুল করীম, কলসাকান্দা হরিণাকুড়ি, নেত্রকোণার সাথে খলিলুর রহমান, পিতা-আলী হোসেন খান, কলসাকান্দা হরিণাকুড়ি, নেত্রকোণার বিবাহ ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৬৯/১৫

* গত ০৫/০৪/২০১৫ আশা জাহান জ্যোতি, পিতা- মোহাম্মদ শাজাহান মোল্লা, তারুয়া মোল্লা পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন আহমদ, পিতা-মৃত জসীম উদ্দিন আহমদ, বিষ্ণুপুর-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৭০/১৫

* গত ১২/০৩/২০১৫ সামিরা আহমদ (ময়না), পিতা-মোহাম্মদ মোবাশ্বের আহমদ, তারুয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাথে মোহাম্মদ মারুফুর রহমান ভূইয়া, পিতা-মৃত আবু তাহের ভূইয়া, কোড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিবাহ ২,০২০,০০০/- (দুইলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৭১/১৫

* গত ২৫/০৩/২০১৫ রিক্তা পারভীন, পিতা-গাফ্‌ফার মির, যতিন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে এনামুল হক গাজি, পিতা-ইসমাইল গাজি, যতিন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৭২/১৫

* গত ২২/০৪/২০১৫ সোনিয়া খাতুন, পিতা-আইয়ুব আলী মোড়ল, যতিন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে সবুজ আহমদ গাজি, পিতা-এলাহি বকশ গাজি, যতিন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ৭২,০০০/- (বাহাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৭৩/১৫

* গত ২৪/০৪/২০১৫ লিলা পারভীন, ইউনুছ আলী গাইন, বড়ভেটখালী, যতিন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে আরাফাত হোসেন, পিতা-আব্দুর রাজ্জাক মাষ্টার, পোঃ পালাত, থানা-রাজাপুর, জেলা ঝালুকাঠির বিবাহ ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৭৪/১৫

* গত ২০/০৪/২০১৫ রোখসানা পারভীন, পিতা-অহিদুল্লাহ্ গাজি, পারকো খালী, যতিন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে লিটন গাজি, পিতা-আজিজ গাজি, যতিন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৭৫/১৫

* গত ২৬/০৪/২০১৫ স্মৃতি পারভীন, পিতা-ইস্রাফিল ফকির, বড়ভেটখালী, যতিন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরার সাথে শফিকুল ইসলাম মোড়ল, পিতা-আব্দুল হাই মোড়ল, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১-এর বিবাহ ১০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৭৬/১৫

* গত ১৩/০২/২০১৫ ফাতেমাতুজ জহুরা, পিতা-ফরিদ আহমদ সরকার, গ্রাম-বালিয়া, পোঃ চরসিন্দুর, থানা-পলাশ, নরসিংদীর সাথে মোহাম্মদ সুমন হোসেন, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল বারী, ধনবারী, টাঙ্গাইল-এর বিবাহ ২০০,০০১/- (দুইলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৭৭/১৫

* গত ২৫/০৩/২০১৫ ফুলবানু আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ কাশিম মিয়া, শালশিড়ি, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ কিসমত মিয়া, পিতা-মৃত আব্দুল মান্নান, শালশিড়ির বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১২৭৮/১৫

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (২৯ মে, ২০১৫) জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্টে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, আমার পর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে, এরপর কষ্টদায়ক রাজত্ব এবং উৎপীড়ন মূলক রাজত্বের ধারা সূচিত হবে। আর সবশেষে পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফতের ধারা আরম্ভ হবে। এরপর তিনি নিরব হয়ে যান।

উপরোক্ত হাদীস অনুসারে মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর মুসলমানদের মাঝে খিলাফতের ধারা সূচিত হয় এবং ৩০বছর পর্যন্ত তা চলতে থাকে। এরপর মুসলমান বাদশাহ্‌রা নিজেদের খলীফা দাবী করলেও তারা খলীফা ছিলেন না।

এরপর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে মহানবীর নিষ্ঠাবান দাস ও প্রেমিককে প্রেরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় খিলাফতের ধারা আরম্ভ হয় এবং এখন পঞ্চম খিলাফতের যুগ চলছে।

আমরা যারা খোদার রসূলের নির্দেশ অনুসারে এবং তাঁর সালাম পৌঁছানোর মানসে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে মেনেছি, আমরা খুবই সৌভাগ্যবান। কেননা আমরা খোদার মনোনীত ইমাম এবং তাঁর খিলাফতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর নিজের মৃত্যু সংবাদ দিতে গিয়ে বলে গেছেন, যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্‌র চিরন্তন বিধান হলো, খোদা তা'লা দু' ধরনের কুদরত প্রকাশ করেন– যাতে বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি বৃথা আস্ফালনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান। তাই, খোদা তা'লার পক্ষে এখন তাঁর চিরন্তন রীতি পরিহার করা অসম্ভব। কেননা তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত (তাঁর অপার ক্ষমতার দ্বিতীয় বিকাশ)-ও দেখা আবশ্যক আর এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, তা স্থায়ী যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবার নয়।

এরপর হুযূর হুযূর (আই.) খিলাফতের দায়িত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে বর্ণনা করেন। এ যুগের ইমাম খোদার নির্দেশে ঈমান সুরাইয়্যা নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছেন এবং মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত করে দিয়েছেন।

এখন আমরা যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি তাদের ঈমানী দায়িত্ব হলো, এই ঈমানের বলে বলীয়ান হওয়া, নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করা এবং বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ঈমানের এই আলো পৌঁছে দেয়া।

হুযূর (আই.) বলেন, ঐশী বিধান অনুসারে এই জামা'তের ঘোর বিরোধিতা হয়েছে। গভীর ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এই জামাতকে ধ্বংস করার জন্য। দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে যারা শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, ঐশ্বর্য ও জাগতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল তারা জামাতের বিরোধিতা করেছে। দ্বিতীয় খলীফার হাতে বয়আত না করে জামা'তের সহায়-সম্পদ হাতিয়ে নিয়ে কাদিয়ান থেকে বেরিয়ে যান এবং অচিরেই জামাত ধ্বংস হয়ে যাবে এই ছিল তাদের অলীক স্বপ্ন। কিন্তু বাস্তবে কি হয়েছে, জামা'ত ক্রমশ উন্নতি করেছে।

তালীমুল ইসলাম কলেজ দশ বছরের মধ্যে আর্য ও খ্রিস্টানদের হাতে চলে যাবে এই ছিল তাদের হুশিয়ারী কিন্তু এর বিপরীতে আজ দেখুন! সেই কাদিয়ান কত উন্নতি করেছে। শত শত বহুতল ভবন নির্মিত হয়েছে। কোটি টাকা ব্যয়ে এখন স্কুল নির্মিত হচ্ছে। আর শুধু কাদিয়ানই নয় বরং বিশ্বের ২০৬টি দেশে প্রতিদিন জামাত উন্নতি করছে। জার্মানির জামা'তও এর সাক্ষী। কয়েকদিন আগেই জার্মানির লাজনা ও আনসাররা সম্মিলিতভাবে প্রায় ১৯ কোটি রূপী খরচ করে এখানে একটি বহুতল ভবন ক্রয় করেছে। অপরদিকে যারা খিলাফত থেকে বিচ্যুত হয়েছিল আজ তাদের নাম-গন্ধও নেই বরং তাদের মধ্য হতে যারা পুণ্য স্বভাবী তারা আহমদীয়া খিলাফতের আশ্রয়ে এসে ধন্য হচ্ছেন।

হুযূর (আই.) বলেন, শুধু জামাতের উন্নতি এবং জামা'তের পক্ষেই নয় বরং জামা'তের খলীফার উন্নতি এবং তাঁকে সাহায্য সমর্থন দেয়ার কথাও আল্লাহ্ বলেছেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সদাত্মাদের কাছে আল্লাহ্ খিলাফতের সত্যতা সুস্পষ্ট করেছেন। অদৃশ্য থেকে তিনি সরল মনা এবং খোদাভীরু লোকদের নির্দেশনা দিচ্ছেন। হুযূর এ সম্পর্কে আফ্রিকার আহমদীদের কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা থেকে বর্তমান আহমদীয়া খিলাফতের প্রতিও খোদার সাহায্য ও সমর্থনের ধারা কীভাবে অব্যাহত রয়েছে তা সুস্পষ্ট।

এরপর হুযূর (আই.) জামা'তের কর্মকর্তা এবং আলেমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে, মানুষের কাছে খিলাফতের কল্যাণ এবং গুরুত্ব সম্পর্কে বারবার বলা এবং মানুষকে খিলাফতের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ করা। আপনাদের উচিত খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কেননা তিনি আপনাদেরকে আজ ধর্মসেবার জন্য বেছে নিয়েছেন।

আর খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁর ইবাদত, সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার যথাযথভাবে প্রদান করা এবং শির্ক থেকে মুক্ত থাকার বিষয়ে যত্নবান হতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুধান করে তা পালনের তৌফিক দিন এবং খিলাফতের আশিস ও কল্যাণে ভূষিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (১২ জুন ২০১৫) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, "খোদার ফযল ও নিয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তাহলে তাঁর ভালবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।"

যখনই আমি সফরে যাই আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপা বর্ষিত হতে দেখি আর আমাদের সফর প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করে। সম্প্রতি আমি জার্মানী সফর করি, বার্ষিক জলসায় যোগদান মূল উদ্দেশ্য হলেও এখানে তিনটি নবনির্মিত মসজিদ উদ্বোধন করা হয় এবং বেশ কয়েকটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সৌভাগ্য হয়।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জার্মানির জলসা খুবই সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য জার্মানী জামাতের উচিত খোদার প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাহলে তারা খোদার বর্ধিত ভালবাসায় সিক্ত হবে।

হুযূর বলেন, খোদার কৃপা ও অনুগ্রহ কীভাবে জামাতের ওপর বর্ষিত হয় তা আপন-পর সবাই প্রত্যক্ষ করেন। এবারের জলসায় পূর্ব ইউরোপ, রাশিয়া এবং জার্মানীর পার্শ্ববর্তি বিভিন্ন দেশ থেকে নবাগত আহমদী, অ-আহমদী এবং অনেক অমুসলমান বন্ধু যোগদান করেন। অনেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এই জলসায় যোগদান করেন। তাদের ওপর জলসা এবং জলসার পরিবেশ কীরূপ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আলবেনিয়া থেকে ১৬ জন প্রতিনিধি আসেন এবং এদের মধ্যে ২জন বয়আত করেন।

মেসিডোনিয়া থেকে ৬২জনের একটি প্রতিনিধি দল আসেন এদের মধ্যে ২জন সাংবাদিকও ছিলেন। এছাড়া অন্যান্য দেশের যারাই জলসায় যোগদান করেছেন তারা নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আপনাদের বাণী আমাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আপনাদের সেবা, আন্তরিকতা এবং আদর্শ দেখে আমরা মুগ্ধ। আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি কিন্তু এরূপ ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ ধর্মীয় পরিবেশ, শৃঙ্খলা, সদ্ব্যবহার, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালবাসা কোথাও পাইনি।

আপনাদের খলীফার বক্তব্য আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। তিনি যে ইসলামের কথা বলেছেন, তা কুরআন সম্মত। এই ইসলাম মানতে আমাদের কোন সমস্যা নেই। আপনাদের জলসা দেখে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহ আরো বাড়ছে। সকল দেশে মিশনারী পাঠিয়ে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে আপনাদের এই ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতির বাণী পৌঁছানো প্রয়োজন। এর মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

অনেকে হুযূরের বক্তৃতা শুনে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতকার ও প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত থেকে বয়আত করেছেন। আপনাদের জামাতের ছোট-বড় সবাই পরস্পরের সাথে হাসিমুখে মিলিত হয়, কুশলাদি বিনিময় করে, যদিও তাদের ভাষা আমরা বুঝিনি কিন্তু তাদের আচার-আচরণ আমাদের বিমুগ্ধ করেছে। এখন আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের শ্লোগান ***"ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে"*** এটি শুধু বুলি সর্বস্ব নয় বরং আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রতিফলন দেখে আমরা অভিভূত ও অনুপ্রাণিত।

জলসার পরিবেশের জাদু এবং সম্মোহনী শক্তি থেকে আমরা এখনো বের হতে পারছি না। আবার অনেকে বলেন, যে ব্যক্তি আহমদীয়া জামাতকে কাছে থেকে দেখে সেই বুঝে যে, মৌলভীরা এই জামা'ত সম্পর্কে কত বড় মিথ্যা কথা বলে। খলীফার পিছনে নামায পড়ে তৃপ্তি পেয়েছি আর জীবনে প্রথমবার নামাযে অশ্রু বিসর্জনের সৌভাগ্য হয়েছে। খলীফা অতি সহজ ভাষায় জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের সংবাদ দিয়েছেন। এটি একমাত্র আহমদীয়া জামা'তেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

আহমদীয়াত গ্রহণের আগে সবকিছু কঠিন মনে হত আর এখন সবকিছু সহজ মনে হয় আর প্রতিদিন খোদার নিদর্শন দেখার সৌভাগ্য হচ্ছে।

হুযূর (আই.) বলেন, এ ধরনের অনেক কথাই জলসায় যোগদানকারীরা নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রকাশ করেছে। এসব ইতিবাচক কথা আমাদেরকে যেন খোদার কৃতজ্ঞতার প্রতি আকৃষ্ট করে।

হুযূর আরো বলেন, জলসা, মসজিদ উদ্বোধন এবং মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন। তারাও আহমদীয়াত ও ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হতে পেরে জামা'তকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এবং নিজ নিজ এলাকায় আহমদীদের স্বাগত জানান।

হুযূর (আই.) বলেন, এসব অনুষ্ঠানের সংবাদ স্থানীয় ও জাতীয় পত্র-পত্রিকা ফলাও করে প্রচার করেছে, এছাড়া বিভিন্ন পত্রিকা আমার সাক্ষাতকার প্রকাশ করেছে, রেডিও, টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে এসব অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রচার করা হয়েছে আর এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী প্রচারিত হয়েছে।

যখনই আমি সফরে যাই আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপা বর্ষিত হতে দেখি আর আমাদের সফর প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করে। সম্প্রতি আমি জার্মানী সফর করি, বার্ষিক জলসায় যোগদান মূল উদ্দেশ্য হলেও এখানে তিনটি নবনির্মিত মসজিদ উদ্বোধন করা হয় এবং বেশ কয়েকটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সৌভাগ্য হয়।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, অস্টেলিয়ার ৩২ তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, অস্ট্রেলিয়া তাদের জাতীয় ইজতেমা কেন্দ্রের বাইরে উদযাপন করার সৌভাগ্য লাভ করে। এ বছর ৩২তম জাতীয় ইজতেমা এডিলেডের মাহমুদ মসজিদে, গত ৩, ৪ ও ৫ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার হাজার হাজার কিলোমিটার দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে খোদ্দাম-আতফালগণ মাহমুদ মসজিদে সমবেত হয়।

শুক্রবার সকাল ১১টায় সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, অস্ট্রেলিয়া জনাব ওয়াকাস আহমদ এর তত্ত্বাবধানে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। সদর সাহেব সরেজমিনে আবাসন ব্যবস্থা, লঙ্গরখানা, অডিও-ভিডিও, রেজিস্ট্রেশন, খেলাধুলাসহ অন্যান্য আয়োজন পরিদর্শন করেন।

পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ইজতেমার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর এই পরিদর্শন করা হয়। জুমুআর নামাযের পর পবিত্র কুরআন ও নযম পাঠের মাধ্যমে ইজতেমার প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সদর সাহেব আহাদ পাঠের পর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তার বক্তৃতায় সদস্যদের ধর্মীয় দায়িত্বের প্রতি যেমন, নিয়মিত পাঁচবেলা নামায পড়া এবং হুযূরের খুতবা শোনার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সদর সাহেব এবারের ইজতেমার মূল শিরোনাম ***"মোহাম্মদ"*** বলে উল্লেখ করেন, কীভাবে আমরা ইসলামের সত্যবাণী প্রচার করতে এবং আল্লাহ্‌র রসূলের আদর্শ নিজ নিজ জীবনে অবলম্বন করতে আরো সক্রিয় হতে পারি এ বিষয়ে তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নিরব দোয়ার পর খোদ্দাম ও আতফালদের মাঝে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রথম দিন কুরআন তিলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা সহ অন্যান্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। খোদ্দাম ও আতফালগণ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে এসব প্রতিযোগতিায় অংশ গ্রহণ করে। যেহেতু সকল প্রতিযোগী খুব ভাল প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল তাই বিচারকদের জন্য ফলাফল নির্ণয় করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।

প্রথা অনুযায়ী ইজতেমার অন্য ২দিন বাজামাত তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযের পর দরস প্রদান করা হয়। সকালের নাস্তার পর খোদ্দাম ও আতফালদের খেলাধুলা প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সকল সদস্যগণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। খেলাধূলা প্রতিযোগিতায় চিরাচারিত খেলা যেমন, এ্যাথলেটিক্স, ক্রিকেট, ফুটবল এবং ভলিবল ছিল। বল্লম নিক্ষেপ এবছর নতুন প্রতিযোগিতা হিসেবে সংযোজন করা হয়, যা খোদ্দামদের দৃষ্টি কাঁড়তে সক্ষম হয়েছে। খোদ্দাম ও আতফালরা এসব খেলা খুবই উপভোগ করে এবং আগ্রহী দর্শক হিসেবে তারা দিনভর খেলোয়াড়দের উৎসাহ যুগিয়েছেন।

শুক্রবার মাগরিব ও ইশার নামাযের পর একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। শনিবার যোহর এবং আসরের নামাযের পর স্থানীয় মুরব্বী সাহেবের সহযোগিতায় একটি তরবিয়তী অধিবেশন এবং তবলীগি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এবছর প্রথম বারের মতো ১৮ বছর উর্ধ্ব বয়সের খোদ্দামদের জন্য একটি বিয়ে-শাদী বিষয়ক সেমিনারেরও আয়োজন করা হয়। এটি ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী তথ্য দেয়া হয়।

শেষ দিন খেলাধুলার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মাঝে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। সমর্থকরা তাদের নিজ নিজ দলের জয়ের জন্য উল্লাস প্রকাশ করে। খোদ্দাম এবং আতফালগণ প্রতিটি খেলায় তাদের খেলোয়ার সূলভ মনোভাব ও ভাতৃত্ব প্রদর্শন করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠান রোববার যোহর এবং আসরের নামাযের পর প্রথা অনুযায়ী পবিত্র কুরআন ও নযম পাঠের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়। এরপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় আমেলার সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগের রির্পোট পাঠ করেন। ইজতেমায় মোট উপস্থিতি ছিল ৫২৫ জন, যা গত বছরের চেয়ে ৭৫জন বেশি।

সদর সাহেব তার সমাপনী ভাষণে ইজতেমার আয়োজন সফল করার জন্য সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি সকল খোদ্দাম ও আতফালকে আবারো স্মরণ করিয়ে দেন, ইজতেমার মূল লক্ষ্য হচ্ছে- তরবীয়ত এবং এই ইজতেমা সফল তখনই হয় যখন আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উত্তম গুণাবলীতে অভ্যস্ত হই, উত্তম অভ্যাস সৃষ্টির চেষ্টা করি এবং আল্লাহ ও খিলাফতের সান্নিধ্য লাভের যোগ্য হই। নিরব দোয়ার মাধ্যমে এই মহতি ইজতেমা সমাপ্ত হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, হল্যান্ডের ৩৫তম বার্ষিক জলসা সফলভাবে অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় গত ৮, ৯ ও ১০ই মে, ২০১৫ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হল্যান্ডের ৩৫তম বার্ষিক জলসা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের জলসার মূল প্রতিপাদ্য ছিল, "ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহ্‌মাতাল্লিল আলামীন" অর্থাৎ, আর আমরা তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল আশীর্বাদ রূপেই প্রেরণ করেছি।

জলসার কার্যক্রম যথারীতি পতাকা উত্তোলন এবং দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর জুমুআর নামায শেষে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি হুযূর আনোয়ার (আই.) জুমুআর খুতবা শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়।

উক্ত জলসায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, লন্ডনের কেন্দ্রীয় মিশনারী মওলানা আখলাক আহমদ আঞ্জুম সাহেব। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল "শত্রুদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর ব্যবহার"। এছাড়া অন্যান্য বক্তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন।

হল্যান্ড জামাতের রীতি অনুসারে জলসার দ্বিতীয় দিন ডাচ ভাষায় অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করা হয় এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ নৈশ ভোজের মাধ্যমে এ দিনের পর্বটি শেষ হয়।

আল্লাহ্ তা'লা জলসায় যোগদানকারী সবাইকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্য কর্তৃক আয়োজিত মসরূর আন্তর্জাতিক T20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-এর সফল আয়োজন

প্রতিবারের মত এবছরও আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের সেহতে জিসমানী বিভাগের তত্ত্বাবধানে গত ২১শে মে থেকে ২৫ মে পর্যন্ত আয়োজিত হয়ে গেল মসরূর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

এ বছর ১৪টি বিভিন্ন দেশ হতে মোট ২১টি দল এই T20 ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। প্রায় ২০০ জন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় ১৪টি দেশ হতে ভ্রমণ করে যুক্তরাজ্যের সারে'তে অবস্থিত বাইতুল ফুতুহ মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করে।

এখানেই গত ২১শে মে, ২০১৫ তারিখে উদ্বোধনী অধিবেশন আয়োজন করা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের আমীর জনাব রফিক আহমদ হায়াত এ উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। আন্তর্জাতিক মসরূর ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চেয়ারম্যান জনাব মির্যা আব্দুর রশিদ উপস্থিত দলগুলোকে স্বাগত জানান। সম্মানিত আমীর সাহেব মুসলমানদের আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পর্কে দলগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এ বছর খড়হফড়হ খরাব ঘবংি এর পক্ষ থেকে টুর্নামেন্টের আয়োজকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, যাতে তারা এ টুর্নামেন্টের খুঁটিনাটি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং কীভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এ টুর্নামেন্ট আয়োজনের মধ্য দিতে গত ৭ বছর যাবত দক্ষ খেলোয়াড়দের উৎসাহ প্রদান ও সুযোগ দিয়ে আসছে তা তুলে ধরেন। শুক্রবার সকাল ৯ ঘটিকায় প্রথম দিনের গ্রুপ পর্যায়ের প্রতিযোগীতামুলক ম্যাচ আরম্ভ হয়। একই দিন বিকেলে একটি বিশেষ ফটোসেশন আয়োজন করা হয় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.)-এর সাথে। এ সময় খেলোয়াড়রা হুযূরের একান্ত সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটানোর সৌভাগ্য লাভ করে।

তিনদিন ব্যাপী গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলোতেও বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়রা তাদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। এটি সুস্পষ্টভাবে অনুমেয় যে, এ টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে কয়েকজন নতুন ও তরুণ খেলোয়াড় সহ প্রতিটি দল খুবই ভালো প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল।

গ্রুপ পর্বের চরম উত্তেজনামূলক ম্যাচগুলো শেষে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নিত দলগুলো ছিল, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, জার্মানী, যুক্তরাজ্য-এ, ওমায়ের একাদশ এবং কানাডা-এ।

কোয়ার্টার ফাইনাল পর্বে দেখা যায় যুক্তরাজ্য ৪৩ রানের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রকে পরাজিত করে। অপরদিকে কানাডা ৬ উইকেটের ব্যবধানে জয় লাভ করে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে। পক্ষান্তরে জার্মানি ৩১ রানের ব্যবধানে যুক্তরাজ্য-এ দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে এবং ওমায়ের একাদশ কানাডা-এ দলকে পরাজিত করে ৫ উইকেটে।

টুর্নামেন্টের শেষ দিন চরম উত্তেজনামূলক সেমি-ফাইনাল পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে যুক্তরাজ্য পরাজিত করে ওমায়ের একাদশকে। পক্ষান্তরে কানাডাকে পরাজিত করে জার্মানি ও ইংল্যান্ড ফাইনালে পৌঁছে যায়। পরবর্তীতে ওমায়ের একাদশ এ টুর্নামেন্টে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের সম্মানীত আমীর জনাব রফিক আহমদ হায়াত। এ ম্যাচকে কেন্দ্র করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সহস্রাধিক ক্রীড়ানুরাগী মাঠে উপস্থিত হন খেলা উপভোগের জন্য। উত্তেজনামূলক ৩৭ ওভার ম্যাচ শেষে ইংল্যান্ড নৈপুণ্য ও দক্ষতা বলে ৫০ রানের ব্যাবধানে বড় জয় পায় জার্মানীর বিপক্ষে। এই জয়ের ফলে যুক্তরাজ্য দল পরপর তিনবার এই টুর্ণামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে।

সম্মানিত আমীর সাহেব সমাপণী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং বিজয়ী দলের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন। অতঃপর তিনি দোয়া পরিচালনা করেন এবং এর মাধ্যমে ৭ম বার্ষিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সফল সমাপ্তী ঘটে।

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স

ওয়েবপেজ ডিজাইন (HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ সাইদুর রহমান
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৯১১ ৫০১৮৩২

গাম্বিয়ায় ৩৯তম বার্ষিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১০ থেকে ১২ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, গাম্বিয়ার ৩৯তম বার্ষিক জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে মসরূর সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুল প্রাঙ্গণে। এই জলসাকে সফল করার জন্য স্বেচ্ছাসেবীরা বেশ কয়েকমাস ধরে কঠোর পরিশ্রম করেন। এ বছর হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে মোহতরম ইব্রাহীম আখলাফ সাহেবকে গাম্বিয়া প্রেরণ করেন। তিনি একজন আরব আহমদী এবং লন্ডনস্থ আরবী ডেস্কের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার আগমনে দেশের ওপর জামাতের গভীর প্রভাব পড়েছে। কেননা, এখানে স্থানীয় মৌলভীরা প্রচার করে রেখেছিল যে, আহমদীয়া জামাতের সম্পর্ক হচ্ছে পাকিস্তানের সাথে, আরবে কোনো আহমদী নেই।

এবার জলসার মূল প্রতিপাদ্য ছিল ***"মহানবী (সা.) বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ"***। নবাগত আহমদীদের একটি বড় দল এবার জলসায় যোগদান করেন।

জুমুআর নামাযের পরপরই হুযূরের প্রতিনিধি মহোদয় জামাতের প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। এরপর পতাকা উত্তোলন শেষে জলসার প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় হুযূরের প্রতিনিধির সভাপতিত্বে। মোহতরম ইব্রাহীম আখলাফ সাহেব তার বক্তৃতায় বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভালবাসা ছিল অতুলণীয় ও ঐকান্তিক। এই অধিবেশন শেষে একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয় যাতে দেশের সকল প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ যোগদান করেন।

আল্লাহ্‌র কৃপায় জলসার ৩দিনই বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায এবং কুরআন ও হাদীসের দরস প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রচার মাধ্যম এই জলসাকে খুবই গুরুত্বের সাথে প্রচার করে। জলসার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে, তবলীগ ও তরবীয়ত। আর এভাবে এই জলসার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। অস্থির ও অশান্ত পরিবেশ বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে প্রায় আট সহস্রাধিক নারী-পুরুষ ও অতিথি এবারের জলসায় যোগদান করেন বলে সূত্র জানিয়েছে।

খোদ্দামুল আহমদীয়া মরিশাসের উদ্যোগে 'সাইক্লিং রেস'-এর আয়োজন

আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে গত ১৮ এপ্রিল, ২০১৫ আহমদীয়া মুসলিম জামাত মরিশাস বার্ষিক 'সাইক্লিং রেস' এর আয়োজন করে। রেস শুরু হয় রোজহিলে অবস্থিত মরিশাস জামাতের প্রধান কেন্দ্র থেকে। প্রায় ৫০ জনের অধিক খোদ্দাম ব্যাপক উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এ রেস শুরু হয় রোজহিল থেকে এবং শেষ হয় বেলে মার এ গিয়ে, যা প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরত্বের পথ এবং ৩ ঘন্টার সফর।

রেস শুরু হওয়ার পূর্বে সম্মানিত আমীর সাহেব খোদ্দামদের উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করেন এবং দোয়া করান। মরিশাস জামা'তের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে খোদ্দামদের টি-শার্ট বিতরণ করা হয়, যাতে লেখা ছিল "শান্তির তরে মুসলিম"। এ সফরটি ছিল অত্যন্ত আনন্দায়ক এবং উপভোগ্য। বেলে মারের একটি উপকূলবর্তী একটি জায়গায় ক্যাম্প স্থাপন করা হয় এবং এ সময় আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয় অংশগ্রহণকারীদের জন্য। বিভিন্ন জায়গায় খোদ্দামরা ব্যানার লাগায়, যাতে লেখা ছিল "ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে"। কিছুক্ষণ বিরতির পর সৈকতে একটি ভলিবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে মিশনারী ইনচার্জ মরিশাস জনাব মুবারাক নাজির সাহেব খোদ্দামদের তরবীয়ত মূলক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন, এরপর খোদ্দামরা হাস্যকর কৌতুক পরিবেশন করে, যা রাত্রিকে আরও আনন্দঘন করে তুলে।

জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

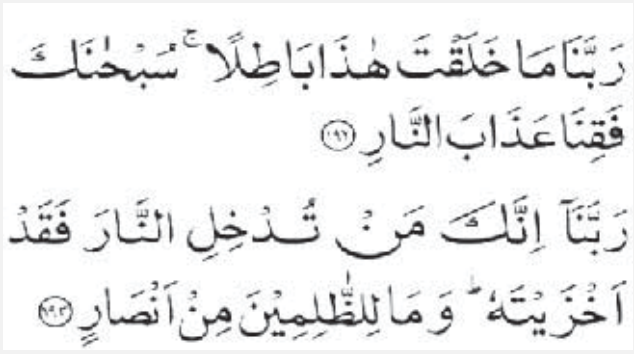
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩٢﴾
رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ
اَخْزَيْتَهٗ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿١٩٣﴾

"রাব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলান সুবহানাকা ফাকিনা আযাবান্নার।
রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলান্নারা ফাকাদ আখযাইতাহু ওয়ামা লিয্ যোয়ালেমীনা মিন আনসার"।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এসবকে (আকাশমালাসহ বিশ্বজগৎ) বৃথা সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। সুতরাং তুমি আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যাকে আগুনে প্রবিষ্ট করেছ অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত করেছ। প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(সূরা আলে ইমরান : ১৯২-১৯৩)

ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বিশেষ উপদেশ

(১) ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবন-যাপন খুব কষ্টের হবে।

(২) আহমদী ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভ একান্ত জরুরী। কারণ দুনিয়ার মানুষ উচ্চ শিক্ষিতদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আহমদীরা যদি উচ্চ শিক্ষিত হন, মুত্তাকী (তাকওয়াশীল) হন এবং শরিয়তের বিধান মেনে চলেন, তাহলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চলে আসতে থাকবে। যদি কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং এটা ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এটাই তার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার মত সম্মানজনক হবে।

(৩) আহমদী পিতামাতা নিজেরা শিক্ষিত হন বা না হন, সন্তানদের শিক্ষার প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি দিবেন। আহমদী ছাত্রদের উচিত দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তারা যেন দেশের কায়েদ তথা পথ প্রদর্শক হন।

(৪) পিতামাতার উচিত তারা যেন নিজেদের গৃহের পরিবেশ এরকম বানান যেখানে ছেলেমেয়েরা আধুনিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষাও অর্জন করবে। প্রত্যেক আহমদী ছাত্র উচ্চ শিক্ষার ময়দানে সর্বদা এগিয়ে থাকবে।

(৫) উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য আহমদী ছাত্রদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সুতরাং তোমরা অযথা সময় নষ্ট করবে না। পিতামাতার জন্য এটা ফরয, তাদের ছেলে মেয়েরা ঠিক মত লেখাপড়া করছে কি না তা নেগরানি করবেন।

(৬) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তাভাবনা এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি উন্নত এবং উচ্চ পর্যায়ের হওয়া উচিত। কঠিন পরিশ্রম ও দোয়ার অভ্যাস করা প্রয়োজন। প্রত্যেক পরীক্ষায় ৮০% এর বেশি নম্বর এবং নিজের ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ করা উচিত। শিক্ষা বোর্ডের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের মধ্যে থাকা আবশ্যক।

(৭) শিক্ষা জীবনে ছাত্রীরা পর্দা এবং পোশাক সম্পর্কে কুরআন শরীফের নির্দেশনাবলী কঠোরভাবে মেনে চলবে। যখন আহমদী মেয়েদের বিয়ের বয়স হয়ে যায়, তখন তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া প্রয়োজন। তারপরও পড়াশোনা চালাতে পারবে।

(৮) ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন ক্লাসে যা পড়ানো হয়েছে তা বাড়ি এসে ভাল করে পড়ে নিবে। দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা গৃহে ফিরে কমপক্ষে চার ঘন্টা পড়াশোনা করবে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে কমপক্ষে ছয় ঘন্টা পড়াশোনা করবে। আমেরিকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গড়ে প্রতিদিন চৌদ্দ ঘন্টা পড়াশোনা করে। সিলেবাসের বাইরের বইও পড়ে। ইউরোপে গড়ে তের ঘন্টা এবং রাশিয়াতে গড়ে প্রতিদিন বার ঘন্টা পড়াশোনা করে।

(৯) আহমদী ছাত্ররা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পরিচিত হবে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, কথা-বার্তা এবং চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে সবাই তাদেরকে ভাল জানবে। তারা ইসলামী আদর্শের উত্তম উদাহরণ হবে।

(১০) আহমদী ছাত্ররা সর্বদা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবে। চিরকৃতজ্ঞ বান্দা হবে। তারা কুরআন মজীদ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনের আসল উদ্দেশ্য ইবাদতকারী বান্দা হওয়া। প্রতিদিন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। যারা নামাযী হবে আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা প্রদান করবে। আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি থেকে উপকৃত হওয়া প্রয়োজন।

(১১) আহমদী ছাত্রদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। তারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে; মন্দ থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখবে। সবাই চিনবে ও জানবে যে, তারা আহমদী, তারা নীতিবান ও আদর্শবান। একথা বলতে বাধ্য হবে যে, আহমদীরা চরিত্রবান, ইবাদতকারী এবং দেশ ও দশের সেবা করে।

(১২) আহমদী ছাত্ররা ইবাদতগুযার হবে। সাথে সাথে দেশ ও জাতির সেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে এবং প্রস্তুত থাকবে। এতে করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের পড়াশোনা সহজ করে দিবেন।

(১৩) আহমদী ছাত্ররা প্রতিদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই পড়বে। সাধারণ জ্ঞানের জন্য পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ভালভাবে পড়বে।

(১৪) পরীক্ষার হলে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হাত তুলে দোয়া করার পর পরীক্ষা দেয়া শুরু করবে।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ৩০ এপ্রিল ২০১০)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।" (সূরা বাকারা : ২৫১)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।" (সূরা আলে ইমরান: ৯)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন" (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "বোরকা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বোরকা যেন জাকজমক ও আরম্বড়পূর্ণ না হয়। বোরকার কাপড় যেন এমন না হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর কাপড় কাটা ও শেলাইয়ের সময় যেন লৌকিকতা অবলম্বন না করা হয়। বরং বোরকা যেন সাদামাটা কাপড় দিয়ে সাধারণভাবে শেলাই করে ঢিলে ঢালা করে তৈরী করা হয়, যাতে শরীরের গঠন বা কাঠামো গোপন থাকে। বোরকা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে বোরকাই যেন লৌকিকতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, আর দেহের গঠন যেন প্রকাশ না পায়।"

"আমি এ খুতবার মাধ্যমে ঐ সকল লোকদের– যারা নিজেদের স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখেন তাদের তাকিদ দিচ্ছি এবং তাদেরকে স্বীয় ইসলামের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ...মিশ্র মজলিসে মেয়েদের যাওয়া এবং পুরুষদের সামনে নিজেদের মুখ অনাবৃত করা এবং তাদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলা ...এই সমস্তই নাজায়েজ কাজ। প্রয়োজনের সময় শরিয়ত তাদের কোন-কোন কাজের স্বাধীনতাও দান করেছে।

...কোন জটিলতাই এমন নয় যে, এর প্রতিকার শরিয়তে রাখেনি। কিন্তু এত বড় পুরস্কার দেয়া সত্ত্বেও যে খোদা তা'লা মানুষের সুবিধার জন্য সর্ব প্রকারের বিধান দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ সে কুরআনের অবমাননা করে। এরূপ মানুষের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাদের জামা'তের মহিলা ও পুরুষদের জন্য এটা ফরজ যে, তারা যেন এরূপ আহমদী পুরুষ ও আহমদী নারীদের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখেন।" (খুতবা জুমুআ, ৬ জুন ১৯৫৮)

"হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।"

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন- "কুরআন তাদেরকে (আহমদী মহিলাদের) এই বলে পর্দার হুকুম দিয়েছে, হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।" (আল ফযল, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭৮)

তিনি নরওয়ের রাজধানী অসলোতে এক অনুষ্ঠানে বলেন- "যে মহিলারা পর্দা করা জরুরী মনে করে না তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তারা পর্দা ত্যাগ করে ধর্মের কি সেবা করেছে? এখন কেউ কেউ বলে থাকে আমাদেরকে এখানে পর্দা না করার অনুমতি দেওয়া হোক, এরপর তারা বলবে আমাদেরকে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে সমুদ্রে গোসল করার ও বালুতে শুয়ে থাকার অনুমতি দেয়া হোক। আমি বলবো এরপর তারা যেন দোযখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযেলের পূর্বে যেন তারা নিজে নিজেই ভাল হয়ে যায়।" (পর্দা প্রগতির দিশারী)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নসিহত করে বলেন, "বোরকার মাঝেও যেন কোন সীমাতিরিক্ত ফ্যাশন না করা হয়। প্রত্যেক সভায় আহমদী বাচ্চাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করুন, আমার বেশি বড় বড় কাজের দরকার নেই, শুধু এই কথাগুলোর উপর দৃষ্টি রাখুন–নামাযের অভ্যাস, পর্দার পাবন্দী, সন্তানদের তরবিয়ত ও বেপরোয়া ফ্যাশন থেকে বাঁচা, এ সকল বিষয়ের তদারকী করবেন। আপনাদের সততা থাকা উচিত। বাইরের পরিবেশের ক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায় যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org

www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

N AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 23rd Issue

Fortnightly **The Ahmadi**

15th June, 2015 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com